বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে —
উচ্চতর পাঠমালার পক্ষে
॥ ১৩ই মার্চ ১৯৯৫ ॥

ভাবনা

পাঠমালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবনা সংকলন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের
'রবীন্দ্রসাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য' উজ্জীবনী পাঠমালার
সঞ্চালক ও নির্দেশক
অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষকে নিবেদিত

P3642

সংকলন ও সম্পাদনা:
মীনাক্ষী সিংহ
লিলি দত্ত
বাঁশরি মুখোপাধ্যায়
কুন্তল রুদ্র
সুমিতা মুখোপাধ্যায়
বিভাবসু দত্ত
সোহিনী ঘোষ
সংযুক্তা গুহ
কৃতজ্ঞতা :
উমর গোস্বামী
মুদ্রক :
ডেক্সোনিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৮এ হরিতকি বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বিগত
সপ্তাহ তিনেক ধরে
নস্টালজিয়ায় আপ্লুত
হওয়া গেল। শিক্ষকতার পেশায়
নিযুক্ত আমাদের কয়েকজনের অনুভবে
ফিরে এল হারিয়ে যাওয়া ছাত্রজীবনের নানারঙের
দিনগুলি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম
মাফিক আমাদের প্রত্যেককে যে নিবন্ধগুলি
পেশ করতে হয়েছে সেগুলিকেই প্রস্তাবনা
আকারে সংকলন করে আমরা এই
উজ্জীবনী পাঠমালার স্মৃতিকে স্থায়ী
ভাবে মুদ্রিত করতে চাইলাম। এই
স্মরণিকা রইল আমাদের
উজ্জীবনের যথার্থ দলিল
হয়ে। এই ভাবনার
ভাস্কর্য স্বীকৃতি
পেলে আমরা
ধন্য।
১২.৩.৯৫

আমাদের প্রাপ্তি

তিন সপ্তাহ। সময়ের হিসাবে হয়তো অতি সামান্য, কিন্তু আমাদের অনুভবে এটি হয়ে রইল অসামান্য।

আমরা, প্রত্যক্ষত যাদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল এই উজ্জীবনী পাঠমালা (ফেব্রুয়ারি ২১-মার্চ ১০, ১৯৯৫), তারা এই কটি দিন কী ভালো লাগায়, কী পাওয়ায়, কী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলাম তার স্মারক হয়ে থাকল এই পুস্তিকার পৃষ্ঠাগুলি, হারভাঙ্গা ভবনে, অশ্রুতোষ ভবনের তেরো সংখ্যক কক্ষে এবং সেসব ছাড়িয়ে আমাদের অন্তর মহলের অন্দরে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশিত এই রিফ্রেশার্স কোর্স প্রায়শ চেনা ছকের প্রবাহিত রীতিতেই সীমিত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রবীন্দ্রনাথ ও তুলনামূলক সাহিত্য শীর্ষক এই পাঠমালা রিফ্রেশার্স কোর্সের প্রচলিত গতি ভেঙে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধুমাত্র দুটি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ঘিরে নানা মৌলিক আধুনিক ভাবনা নিয়ে এধরনের পাঠমালায় সচরাচর মেলে না। এটি প্রচলিত ধারা অনুসারী আর একটি মাত্রকোর্সের পাঠ বা নিছক বক্তৃতামালা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে, ছড়িয়ে দিতে পেরেছে আয়োজনকারী ও অংশগ্রহণকারীদের বোধে, মননে ও সহমর্মিতায়।

আমাদের ভালো লেগেছে সমন্বয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক এবং শিক্ষা সাংবাদিকতা প্রশ্নাগার-বিজ্ঞান জাকাতটির তিন অধ্যাপক ডঃ জ্যোতিস্ময় ঘোষের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা, যিনি রবীন্দ্রসাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য পাঠমালার বাইরে আমাদের কৌতূহলকে ছড়িয়ে ও ভরিয়ে দিতে পেরেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি পরিবেশ চিন্তার সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন। তার ফলে বিশেষ বিষয় ছাড়িয়েও আমাদের জানা ও শোনা এক নতুন তল মাত্রা পেয়েছে, আমরা যথার্থই উজ্জীবিত হতে পেরেছি। আক্ষরিক অর্থেও আমাদের প্রাপ্তি অনেক। উদ্যোক্তাদের অনুষ্ঠানের একমুখে ফেব্রুয়ারি শীর্ষক প্রাসঙ্গিক আলোচনার সঙ্গে আমরা পেয়েছি সুসংকলিত স্মারক পুস্তিকা, পেয়েছি সুদৃশ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যাগ (অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের উপযোগী দু'ধরনের) যা ব্যবহার করার সময় আমাদের মনে আসবে এই পাঠমালার অনিবার্য স্মৃতি।

আমাদের সঞ্চয়ের সম্পদ সমৃদ্ধ হয়েছে আয়োজিত বক্তৃতা ও আলোচনায় যা সংখ্যায় প্রায় একশোর কাছাকাছি। এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর এবং এর সঙ্গে সমন্বয় বিধায়ক অধ্যাপক ঘোষের উদ্যোগ ও দূরদৃষ্টি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো হওয়া আমরা ৩৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা এই তিন সপ্তাহ ঘুরে ফিরে পেছি অতীত স্মৃতিময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দময়। অনুভব করেছি আসলে আমাদের জানা শোনা বোঝার কোনো শেষ নেই। শেষ হয় না।

তাই এমনি ভাবে উজ্জীবিত হতে পারার সুযোগ পাওয়ায় অধ্যাপক ঘোষকে আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই যিনি এই তিনটি সপ্তাহ ছিলেন আমাদের শিক্ষক, নির্দেশক সহায়ক ও বন্ধু।

সূচীপত্র

প্রসঙ্গত ● জ্যোতির্ময় ঘোষ

রবীন্দ্রভাবনার প্রেক্ষিতে সন্ন্যাস ও সংরোগ ● সুমিতা মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলাকাব্যে রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ● দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার মূলে মানব ● অহরলাল বেরা

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মুক্তি ● বন্দনা রায়

রবীন্দ্রনাথ : ক্রান্তদর্শীর চোখে স্বাধীনতা ● জ্যোতির্ময় গোস্বামী

চিত্রাঙ্গদা-রক্তকরবী-সে : তিন চিত্রশিল্পীর চোখে ● মণিদীপা দাস

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রূপকথা শিল্প ● সুমিতা দাস

'মধুর সে কম নাই তার' ● নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাতকার নারীমুক্তি ● স্বাতী সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত' নারী ● সোহিনী ঘোষ

'কল্পনা' : রোম্যান্টিক স্বপ্নচারণার রবীন্দ্রভাষ্য ● মীনাক্ষী সিংহ

রবীন্দ্রনাটকের কয়েকটি রাজা চরিত্র : কিছু চিন্তা ● বিভাবসু দত্ত

'যোগাযোগ'-এর বিতর্কিত সমাপ্তি ● লিলি দত্ত

শিশুমনস্তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ ● আশরাফ হোসেন

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের চোখে আইনের দুনিয়া ● ছন্দা রায়

ঈশানকোণে রবীন্দ্রনাথ ● অমলেন্দু ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র উপন্যাস : একটি প্রশ্ন ● অরুণ বসু

রবীন্দ্রসাহিত্যে গৃহপালিত পশুপক্ষী ● রণজিৎ বিশ্বাস

রবীন্দ্রকবিতায় প্রকৃতি ● মিনতি দেবনাথ

কনকচাঁপার কঙ্কাল ● কুন্তল রুদ্র

লণ্ডনের ডাকে 'ডাকঘর' এবং প্রাসঙ্গিক অনুভবমালা ● সুনীল দাস

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকথা ● লিলি ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' — কয়েকটি কথা ● সুচিত্রা সেন

আমার ভালবাসার গান ● কবিতা চন্দ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে লোককাহিনী ও রূপকথার প্রভাব ● বাঁশরি মুখোপাধ্যায়

'গদ্যিকা' রীতির রবীন্দ্রনাথ ● দিলীপ কুমার নন্দী

রবীন্দ্রনাথ : সুধীন্দ্রনাথ ● সংযুক্তা গুহ

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকজন নিঃসঙ্গ রমণী প্রসঙ্গ ● ব্রততী ঘোষরায়

প্রসঙ্গ : চোখের বালি পরিণতি ● বিভূপদ বেরা

আমাদের ঠিকানা

সুমিতা দাস
১১৯ রাজাবাগান
পোঃ বৈদ্যবাটি
জেলা-হুগলী
৭১২২২২

নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬ বি. মাইকেলনগর
উত্তর চব্বিশ পরগণা

দেবব্রত বিশ্বাস
৬৩৩/১ ব্লক-৩
নিউ আলিপুর
কলকাতা-৭০০০৫৩

লিলি দত্ত
উত্তরণ
সি ডি. ১৯৫ বিধাননগর
কলকাতা-৭০০০৬৪

রঞ্জিতকুমার বিশ্বাস
ইন্দা (উত্তর)
পোঃ ইন্দা
খড়গপুর
মেদিনীপুর

মল্লিকা দাসশর্মা
লামডিং কলেজ
জেলা-নওগাঁ
আসাম
৭৮২৪৪৭

নদীপকুমার পাল
২৫৩ এ বসুনগর
নবগ্রাম
উত্তর চব্বিশপরগণা
৭৪৩২৭৫

সুচিত্রা সেন
১১ বি ফনন্দোপাল সেন
কলকাতা-৭০০০১২

অরুণকুমার বসু
১, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেন
হাওড়া-৭১১১০২

সুশীলকুমার দাস
৫, পরমহংসদেব রোড
কলকাতা-৭০০০২৭

হেম ভট্টাচার্য
১৮ এফ, নর্দান এভিনিউ
কলকাতা-৭০০০৩৭

রাধাচন্দ্র বসু
এ ডি ৩৮৩ রবীন্দ্রপল্লী
প্রফুল্লকানন
কলকাতা-৫৯.

কুন্তল রুদ্র
ঘুটি
পূর্বপল্লী (উত্তর)
পোঃ শান্তিনিকেতন
বীরভূম
৭৩১২৩৫

মনিদীপা দাস
৪৯৮/১ এস পি বি ব্লক
চিত্তরঞ্জন কলোনী
রিজেন্ট এস্টেট
কলকাতা-৭০০০৯২

কবিতা চন্দ
সি ২৪২/এ সি আই টি. রোড
কলকাতা-১০

সুভাষ কর্মকার
এন সি কলেজ
পোঃ কলয়পুর
করিম গঞ্জ
আসাম

মিনতি বেরনাথ
প্রযত্নে : গীরেনচন্দ্র চৌধুরী
অমরপল্লী
পোঃ জলপাইগুড়ি
জেলা-জলপাইগুড়ি
৭৩৫১০১

জহরলাল বেরা
প্রযত্নে : অনীতা মণ্ডল
অরবিন্দনগর
পোঃ মেদিনীপুর
জেলা-মেদিনীপুর
৭২১১০১

সংঘমিত্রা গুহ
মেদেরপাড়া বয়েজস্কাউটস
কৃষ্ণনগর
জেলা-নদীয়া

লিলি ঘোষ (দাস)
প্রযত্নে : রঞ্জিত দাস
হনুমবনি পাবলিশি
পোঃ জামশেদপুর
জেলা-জামশেদপুর
বিহার

মীনাক্ষী সিংহ
১৯/সি নীলমণি মিত্র স্ট্রীট
কলকাতা-৬

সুমিতা মুখোপাধ্যায়
৪৯ বি/১বি বেলেঘাটা মেন রোড
কলকাতা-৭০০০১০

বন্দনা রায়
১৭ জে ইস্ট রোড
ফ্লাট-৮
কলকাতা-৭০০০৩২

আনোয়ার হোসেন
সাবলপুর হাউসিং
কোয়ার্টার-এম/৪
বর্ধমান

অমলেন্দু ভট্টাচার্য
গুরুচরণ কলেজ
শিলচর-৪
জেলা-কাছাড়
আসাম
৭৮৮০০৪

বাঁশরি মুখোপাধ্যায়
প্রযত্নে : উদয় গোস্বামী
ফ্লাট নং-ই ১৬
শুভদা অ্যাপার্টমেন্ট
পি-১২৬ উদয় পার্ক
কলকাতা-৭০০০৮৪

সোহিনী ঘোষ
সি ৭ গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট
৬০/৬৭ বি. টি. রোড
কলকাতা-২

ছন্দা রায়
শিবনাথ ভবন
ফ্লাট-এফ ১৫
পড়িয়াহাট রোড
কলকাতা-৭০০০২৯

কণিকা বিশ্বাস
বি ৩/৬ সিটি সেন্টার
আর এইচ. ই. সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর-১৬
বর্ধমান
৭১৩২১৬

স্বাতী সেনগুপ্ত
৭৫/১৬ জে. পি. চ্যাটার্জি রোড
গোরাবাজার
বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
৭৪২১০১

নিত্যপদ বেরা
গ্রাম. পোঃ-কোড়হাট (অম্বুল)
জেলা:-মেদিনীপুর
৭১১৩০২

বিভাসপু দত্ত
প্রযত্নে : কিরীটিভূষণ দত্ত
গোবরডাঙ্গা, বাবুপাড়া
পোঃ গোবরডাঙ্গা
জেলা-উত্তর চব্বিশ পরগণা
৭৪৩২৫২

প্রতিতী গোস্বামী
'বনতোষিনী'
কলেজপাড়া
রায়পুর
উত্তর দিনাজপুর
৭৩৩১৩৪

নিলীপকুমার নন্দী
৫৫ ই বাগবাজার রোড
কলকাতা
৭০০০৪৭

জ্যোতির্ময় গোস্বামী
পোঃ নবগ্রাম
জেলা : বর্ধমান
৭১৩১৬৬

প্রসঙ্গত

জ্যোতির্ময় ঘোষ

'পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা যতদূর গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর প্রদত্ত পঠ্যাভিরিক্ত বক্তৃতামালার দ্বিতীয়টিতে (৯ ফেব্রুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছিলেন—

'আমার উপরে যে-আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।'

বিশ্বসাহিত্যের চারিত্রনির্ণয়ে প্রবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বক্তৃতায় সাহিত্য বিচারে গ্রাম্য সংকীর্ণতা বর্জন করে সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য তথা বিশ্বমানবের শ্রেক্ষিতে সমগ্রতার বোধে লগ্ন করে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ৯ ফেব্রুয়ারির বক্তৃতাতেও বিষয়টি পরিস্ফুট হয় নি বলে অভিযোগ ওঠায় রবীন্দ্রনাথকে আবার ১২ এপ্রিল তাঁর তৃতীয় বক্তৃতা 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' পেশ করতে হয়েছিল। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিও সামগ্রিকভাবে প্রণিধানযোগ্য। তবু এই রচনা থেকে যদি কোনো দুটি—একটিমাত্র বাক্যও সংক্ষিপ্ততম পরিসরে উদ্ধারযোগ্য বিবেচিত হতে পারে, তা-হলে তা এই—

'ধর্মই বলো, সৌন্দর্যই বলো, যে-কোনো বড়ো জিনিসই বলো-না, যখনই তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয় তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্য বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।'

নদীর মতোই জীবন ও সাহিত্যেরও প্রাণধর্ম নিহিত প্রবহমানতায়। চিরাভ্যস্ত প্রথা পদ্ধতি এক ধরনের সংস্কার, নামান্তরে গতানুগতিকতা। জীবন ও সাহিত্যে বদ্ধমূল গতানুগতিকতা স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণুস্বভাব। প্রাণের ধর্ম গতি, চলিষ্ণুতা। 'কালান্তর' প্রবন্ধেও খুব সুন্দরভাবেই বদ্ধ জলাশয়বৎ জীবন ও সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমায় বহির্বাগত ভিন্নতর আবেগ ও প্রেরণাকে স্বাগত জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বভাবতই, মাতৃভাষা ও সাহিত্য যখনই গ্রাম্য সংকীর্ণতার শিকার হয়ে পড়ে, তখনই ক্রমশ তা গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সেইজন্যই, বিশ্বসংস্কৃতির আলো-জল-বাতাস ও তার যাবতীয় উৎকৃষ্ট ফসল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো' আমাদের অপরিহার্য ও একান্ত সম্পদ। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের গতানুগতিকতাকে কাটিয়ে উঠতে, তাকে নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত ও নব নব মাত্রায় অন্বিত করার জন্য 'Comparative Literature' তথা তুলনামূলক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিত ও চেতনাই অনন্য উৎস।

একদিকে মানুষের স্বদেশ ও জনজীবনের ভাষা ও সংস্কৃতি, এককথায় লোকসংস্কৃতি, অন্যদিকে বিশ্বসংস্কৃতি : গভীরতর বিবেচনায় এই দুইয়ের ব্যবধানও অসেতুসম্ভব নয়, প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেই গতানুগতিকতা বর্জন করে প্রবহমানতায় লগ্ন থাকার এই তো ঠিকানা।

তবু অতীতের জীবন, ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয় রবীন্দ্রকথিত গ্রাম্য সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির জন্য, অপরিহার্য হলো চলমান জীবনের, প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিকতার নতুন নতুন দেশ ও বিশ্ব এবং তার নতুন শিল্পপ্রকরণের প্রয়োগসামর্থ্যও। জীবনানন্দ ১৩৪৫ সালে লিখেছিলেন, যা কণ্ঠস্থ বহুজনের, অথচ কতজনের এখনো জানিনা, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি : কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।'

'কবিতার কথা' নামের একই রচনায় শুরুর এই কথাগুলি স্বল্প ব্যবধানেই সচেতনভাবে উদ্ধৃত করতে হয় জীবনানন্দকে। ১৩৪১ সালেই আবার, 'মাত্রাচেতনা' রচনাটিতে ফিরে আসে একই ধরনের উচ্চারণ নতুন মাত্রার সংযোজনসহ—

'কী করে তা হয় সে অন্য কথা—কিন্তু কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন-থাকে পাতালেও দেখা

যায়, এবং নীলিমায়, কিন্তু প্রধানত এই পৃথিবীর ভিতর, জনসমাজে : কিন্তু মানবসমাজে অগ্রসৃতির বাহন বলে গণ্য হয়েও এবং সর্বত্র উপস্থিত থেকেও শব্দব্রহ্মায় অগ্রসর হবার তাৎপর্য তার নিজের ভিতরে হয়তো নেই জেনে আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ কিংবা আগামীকালের কবিতা—আমাদের এই পৃথিবী মোটামুটি এ রকম ভাবে চললেও একটা সুরসাম্য লাভ করতে পারবে আশা করা যায় : *এবং ভাষার প্রসাদ* : যার অভাবে আধুনিক অনেক কবিতা ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে।'

'এবং ভাষার প্রসাদ'— এই সংযোজনটি অবশ্য লক্ষণীয়।

আসলে, কবিতা তথা সাহিত্য রসোত্তীর্ণ শিল্প হয়ে ওঠে যখন, তখন তাকে বিশ্বসাহিত্য অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্যের প্রেক্ষিকাকে আত্মস্থ করেই হয়ে উঠতে হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ অথবা সঠিক বিবেচনায় মধুসূদন থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পুরোধা যাঁরা, তাঁরা সকলেই নিজস্ব ভাষায় এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধিটিকেই ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যক্ষত, যাঁদের জন্য 'রবীন্দ্রসাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য' নামের এই 'উজ্জীবনী পাঠমালা', তাঁরা কতটা উজ্জীবিত হলেন বিগত সতেরো দিনে দেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যূন পঁচাশি জন অগ্রণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একশো দু' ঘণ্টাব্যাপী উদ্দীপক আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্কের সুযোগে, সে কথা তাঁদের কাছেই শুনেছি, জেনেছি। তাঁরা উল্লসিত। আমিও আপ্লুত। এবং উজ্জীবিত।

কেননা, এই পাঠমালায় প্রথা-ভাঙার একটা চেষ্টা ছিল আমার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ঘোষিত নীতি ও তাদের কৃপণতার স্ববিরোধ এবং আমাদের এই বিশাল ঐতিহ্য সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট ও প্রথানুগত্য এই চেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারত।

পারেনি। কেননা, আমাদের উপাচার্য বিশ্রুত কৃষিবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনারায়ণ বসু স্বয়ং আমার প্রথা-ভাঙার চেষ্টায় প্রেরণার উৎস হয়ে উঠলেন। সহ-উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট সত্ত্বেও যে-মুহূর্তে অনুভব করলেন, অপচয় না করেও ন্যূনতম অর্থ ব্যয়েই সমগ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা আন্তরিক, তাঁরও সুচিন্তিত অনুমোদন পাওয়া গেল। এইভাবেই সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ 'আমাদের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের পরিচালক অধ্যাপক প্রিয়ব্রত মজুমদার, আমাদের উদ্যোক্তা ও পরিকল্পনা-অধিকারিক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলেরই সহৃদয় সহযোগিতা অকৃপণ হতে পারলো। বিভাগীয় সহকর্মী ও অশিক্ষক কর্মীবন্ধুদের এবং সাত্যকি, দীপঙ্কর, শ্রাবণী, মাকসুদা, পিন্টু, চন্দ্রাবলী, ইন্দ্রাণী প্রমুখ ছাত্রছাত্রীদের প্রাত্যহিক সক্রিয় ভূমিকা : সবকিছুই আমার সহায়ক হয়েছে। এ. বি. দি.-র কর্ণধার শ্রীঅশোক কুমার রায়চৌধুরী, তাঁর সহযোগী শ্রী তরুণ সেনগুপ্ত ও তাঁদের প্রত্যেকটি সহকর্মী আমাদের সমস্ত কাজে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাকে এককথায় বলতে হবে 'অমূল্য'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সর্বক্ষণের সহযোগী শ্রী সত্য কাঁড়ার নিত্য জাগ্রত ও নিত্যসক্রিয় থাকায় অনেক অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আমাদের আমন্ত্রিত বক্তারা এক ডাকে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। তাঁরাও আমাদের মতোই পরোক্ষভাবে উজ্জীবিত হয়েছেন বলে অনুভব করেছি। আমাদের উজ্জীবনের উৎস তাঁরাই : প্রত্যক্ষত যাঁদের জন্য এই 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র আয়োজন। তাঁরা সকলেই থাকবেন আমার, আমাদের মনে-মনে ।

রবীন্দ্রভাবনার প্রেক্ষিতে সন্ন্যাস ও সংরাগ

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

"Sex is the main spring of our unconscious" ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কারের পরই আধুনিক চিন্তার জগতে নারী সম্পর্কের ধারণাটা বদলে যেতে থাকে। তত্ত্ব হয় তুমুল সমালোচনা, ওঠে বিতর্কের ঝড়। ১৯৩৪ সালের "বিচিত্রা" পত্রিকার বসে রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডীয় এই ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ করে "সাহিত্যধর্ম" নামে একখানি প্রবন্ধে বলেছেন—

"বকফুল, বেতসফুল, কৃষ্ণচূড়াফুল এইসব রইল কবির বাহির দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, রসাতল ওদের জাত মেরেছে—"

অন্যদিকে কৃষ্ণফুল চন্দনফুল পরহীন হলেও তারা আলোকের জগতে সমাদৃত। অরূপ "পেটের ক্ষুধা" তাদের স্পর্শ করে নি। নরনারীর মিলন পেটের ক্ষুধার মতোই একটা জৈবিক ব্যাপার। ঐ বছরেই বিচিত্রার ভাদ্র চৈত্র সংখ্যায় নরেশ সেনগুপ্ত "সাহিত্যধর্মের সীমানা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রভাবনার বিরোধিতা করে বলেন—"যাহা আমাদের রসবোধের সাড়া জাগায় সেটা আবৃতই হউক আর অনাবৃতই হউক তাহা অর্চ্য।"

ঐ একই সংখ্যায় সাহিত্যিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখলেন—"মনুষ্যের হীনতা, বিভৎসতা, পশুত্ব, অন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না, উজ্জ্বলভাবে উদয় হয় মনুষ্যের একটা নিরবিল মনুষ্যত্ব।"

এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে যে জীবন জিজ্ঞাসায় তথা সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিলেন, নারীপুরুষের প্রেমতত্ত্বের বিশ্লেষণে তিনি কি সেই মনঃ সমীক্ষণ তত্ত্বের অনুবর্তী হয়ে পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের যে মূল সমস্যা "সন্ন্যাস ও সংরাগের দ্বন্দ্ব"—তাই সম্পূর্ণভাবে এই তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমেই দেখা যায় উপন্যাসের অন্তরবর্তী একটি নারী চরিত্র নবীবালা, যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিসত্তার একটি মৌলিক জৈব এষণা যাকে ফ্রয়েড বলেছেন "থনেটস"(thanatos), নীবালা নিজেকে অন্তরঙ্গনের মধ্যে দিয়ে জীবনের অর্থের সমাধানের সূত্রটা খুঁজে নিয়েছে।

এর পরেই একেবারে চলে আসা যায় শচীন ও দামিনীর সম্পর্কের সমস্যায়। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর নাস্তিক শচীন জীবনের আর একটা alternative খুঁজতে চেয়েছে লীলানন্দ স্বামীর রসতত্ত্বে। কিন্তু সেই সব তত্ত্বকথার পাথুরে প্রটির ভেসে যাবে যাবেই একটা উপসূরের তাক "বাঘিন।" শচীন বুঝেছে —"রসের লোক তো ওইখানেই", শচীনের অর্থের সূত্রপাত।

অন্যদিকে দামিনীর চেতনায় রয়েছে 'জীবনেলা মানে Errors.—"সে হল জীবনরসের রসিক ..... যে উনুনে রান্নাকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" জন্মবিকাশের পর থেকেই দামিনী একটা প্রত্যক্ষ চরিত্র, যে ফ্রয়েডের Theory of Pleasure এর দ্বারা জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছে। ওয়াল্ডেড : বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সরাসরিই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের পথ ধরে জীবনসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন,—

"সেই শুভ্র অন্ধকারটা যেন একটা কলের জন্তুর মতো..... তার চোখ নাই, মন নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে..... তার মন নাই।" এই 'কলো জন্তুটা' আসলে শচীনের অবচেতনে ঘুমিয়ে থাকা (Latent) কামনার অন্ধকার । যার তাড়াতাড়ির কোন বোধ নেই। এই অসীম জীবপ্রবৃত্তিরূপে শক্তি ফ্রয়েড যাকে বলেছেন Libido, যা জীবনপ্রবৃত্তির মূল উৎস। "মন" শব্দটাও এখানে অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্রয়েড মানসিক মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, (১)সচেতন, (২) প্রাক্‌চেতন (৩) অবচেতন। রবীন্দ্রনাথ এখানে মন বলতে মানুষের সচেতন মনেরই ইঙ্গিতই করেছেন। আসলে শচীন চরিত্রটা "অবদমন" বা Repression এর শিকার। একদিকে দামিনীর প্রতি শচীনের লালসাসিক্ত চরম আকর্ষণ, অন্যদিকে জাগ্রত চৈতন্যের যে দ্বন্দ্ব তাকে সহ্য করতে পারে না। তাই, চরম reality থেকে সে পালাতে চায় "ঘুমাইতে পারলে বাঁচি"। এর পরে দামিনী সরাসরি শচীনের কামনার আগুনে আত্মাহুতি দিতে এলে শচীন তাকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে সন্ন্যাস ও সংরাগের মধ্যে প্রথমটি বাছতে গিয়ে শচীনকে বলতে হয়—"দামিনী তুমি আমাকে দয়া কর—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" ফ্রয়েডিকতার টলস্টয়ের কলার সিয়ে পার্থ আসে। যে আত্মীড়নের পথ ধরে শেষ পর্যন্ত মেরীর শারীরিক ছলনার ফাঁদে পড়ে আসলে মুক্তি পায় সাধনার সংকীর্ণতা থেকে। শচীনও অরূপ আবেগে বাঁধা পড়ে দামিনীর দেহোদ্যানে, কিন্তু সে তার মুক্তিকে খুঁজতে চায় আত্মদমনের পথ ধরে সংরাগবিহীন সন্ন্যাসে। কিন্তু এই পরিণতি কেন? এটি শচীনের dialectical realism এর উত্তরণ? নাকি জীবনের চরম বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যে নগ্নতা কবর্তব্য, তার থেকে কবিমন সরে গিয়ে মঙ্গলময় পরিণতিতেশান্তি পেতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে দামিনীর পরিণতিতেও প্রশ্ন ওঠে, যে শ্রীবিলাসকে দামিনী তার প্রেমের চরিতার্থতার ক্ষেত্রে ওপুমায় ব্যবহারই করেছে, আবার তাকে বিবাহ করে বসতে চেয়েছে—

"সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই" অবশ্যে দামিনী কার প্রতি বিশ্বস্ত? শচীন না শ্রীবিলাস? আমার মনে হয় শচীনের প্রসঙ্গে প্রেমের যে কর্তব্য এসেছে সে দহন বুকে নিয়েই দামিনী শ্রীবিলাসের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের একটা নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্রয় আসতে চেয়েছে, তার বিপন্ন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

আধুনিক বাংলাকাব্যে রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা

দেবব্রত বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র বিরোধিতা বা প্রভাব অস্বীকারের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। প্রথমত, কবিরাই এই বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলেছিলেন। পরিক বা ঔপন্যাসিকেরা যারা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের কিন্তু সচেতন রবীন্দ্র বিরোধিতার অবতীর্ণ হতে হয়নি।

অনেক সমালোচকের মত সচেতন রবীন্দ্র বিরোধিতা নিয়েই আধুনিক বাংলা কাব্যের সূত্রপাত হয়েছিল। এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল বিশশতকেই। এর কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (২) বিশ ও তিরিশ দশকের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি —বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা—ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা—কমিউনিষ্ট পার্টি ও সংগঠিত বামপন্থী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা—যুদ্ধোত্তর ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ এর উদ্ভব ইত্যাদি। (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও সাহিত্যের মূল্যবোধের পরিবর্তন। এর সঙ্গে আরো দুটি গৌণ কারণ যোগ করা যেতে পারে—

(৪) রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালেই ওস্তাদের-এ পরিণত হয়েছিলেন। অন্ধ ভক্তরা তাঁকে পূজার আসনে বসিয়েছিল। আধুনিক কবিদের বিদ্রোহ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

(৫) বিশ শতকের প্রথম অর্ধে বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের মধ্যে একটি anti-establishment মনোভাব দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও বাংলা সাহিত্য জীবনে প্রায় একটি establishment হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র বিরোধিতাকে এক অর্থে সেই সমাজের anti-establishment আন্দোলনের একটি দেশীয় প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এটি এক হিসাবে যুগের হুজুগ। এই পরিবর্তনের যে লক্ষণ বা পরিণাম ধরা পড়েছিল কাব্যের দেহ ও বিষয়ে তাকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে—

(১) কাব্যের বিষয় (২) কাব্যের স্টাইল (৩) উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহার (৪) শব্দচয়ন

রবীন্দ্রনাথ সেনযুগ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ—সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পার হয়ে আধুনিক আলোয় শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিকুলের কাব্য থেকে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখানো যেতে পারে।

একথা সত্য যে আধুনিক কবিরা সকলেই আলাদা আলাদা পথের পথিক। কবিদের এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে একেবারেই অচলিত এবং আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা একেবারেই ম্লান।

কিন্তু কথাটি একেবারেই সত্য নয়। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাব স্থূল বা দৃশ্যমান ভাবে নেই; আছে সূক্ষ্ম হেমিওপ্যাথিক ডোজের মত। কিন্তু অমোঘ ও অনিবার্য ভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—হাবর মাটিকে যখন জলের বৃষ্টি এসে আঘাত করে তখনই তাতে ফসল ফলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে এইরূপ অসংখ্য সফলমান মেঘখণ্ডের বৃষ্টিধারারূপে বুকে বহন করে নদী হয়ে অন্যদের সাহিত্যক্ষেত্রে বয়মান হয়েছেন। বয়মান নদীর মতই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে অজস্র পলিমাটি বহন করে এনে তাকে সরস ও উর্বর করে রেখেছেন, তা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে চোখে দেখাযায় না। কিন্তু মাটিতে যে ফসল ফলে তা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই নদীমাটিরই দান। প্রভাব বুঝতে হয় গাছের শিকড়, ডালে ও ফুলে; প্রকাশের বা রূপের ভিন্নতা প্রভাবহীনতাকে নির্দেশ করে না।

আধুনিক কবিরাও রবীন্দ্রনাথের মত বিভিন্ন মেঘখণ্ডের দ্বারা স্নাত হয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আহরণ করেছেন কিন্তু এখনও তারা কার্যত রবীন্দ্র-উপত্যকার অধিবাসী, রবীন্দ্র পরবর্তী তথাকথিত বিদ্রোহী কবিদের প্রায় সকলেই একথা তাঁদের জীবদ্দশায় বুঝেছিলেন। তাঁদের পরবর্তী অন্যকবিদের এর ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

আধুনিক কবিদের পরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর প্রাসঙ্গিকতারই প্রমাণ। সমাজ ও সভ্যতার পরে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, যে অতিদ্রুত সৃষ্টি করেছে তা রবীন্দ্রকবিকে 'রহস্যের ঔদাসীন্যে' ধরা পড়েছিল। তার আধুনিক জীবনদর্শনের কবিকে নগরকেন্দ্রিক জীবনের অস্থিরতা ও অন্তর্লোকের সৃষ্টি করেছিল এক 'বিপন্ন' বিস্ময়ের। [বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে সমাজ ও মানবমন সবসময় তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান ফাঁক বা ফারাক গড়ে ওঠে। এক অস্থির অন্তর্লোক সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে। একে অতিক্রম করতেই লেনিন ও মাও-জে-ডং cultural revolution-এর কথা বলেছিলেন।] রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, এই অতিদ্রুতের অস্থির ও অস্থিরতা থেকে উত্তরিত হয়ে গেছেলিলেন। তিনি মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, যার পরিণতি এক দৃঢ় আত্মবন্ধনে। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে এই আত্মবন্ধন ও বিশ্বাস কোন চাপকলের জন্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই বিশ্বাস ওধুমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাস নয়, কোনো অর্থে বিশ্বাস, এমনকি আদর্শহীনতার বিশ্বাসও হতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাসই তার কাছে বড় কথা। জীবনানন্দের পলাতক চেতনা শেষ পর্যন্ত এক বলিষ্ঠ আত্মবন্ধনে পরিণত হয়েছে—' তিমির বিনাশী নয়, আমরা তো তিমির বিনাশী'।

রবীন্দ্রনাথের—'রহস্যের সব আলোই আছে দিনের আলোর পরিধিরে। আর জীবনানন্দ লিখেছেন—

দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়
শাশ্বত ছায়ির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার একটি পাঠযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে অতি আধুনিক কবি লিখেছিলেন—

তিনহাজার লঞ্চরির ভারে পাঁচ খন্ড রবীন্দ্ররচনাবলী লুটায় পায়েপায়ে।

তাদেরই একজন পরে যে কবিতা লিখলেন তাতে তাঁর অজ্ঞাতসারে না জেনেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলেই মনে হতে পারে—

এনেছিলেম চরণচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি,
অন্বেষণায় মিতেই হবে অনুভবে,
অভূমিতল থাকবে কেবল পা দু খানি।
নূতন জন্ম নিয়েছে যার চঞ্চলিকা
সে চায় ফিরে লিখনিকা
মরুপ্রিয়, মিতেই হবে অনুভবে।
খাদ্যতালিকা থাকবে কেবল পা দুখানি।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের মূলস্রোতে, তাঁর প্রসঙ্গিকতাকে বিদ্রূপের ভাষায় বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে
'সাগরে যে পসা আমি সে তোমারি আনন্দ ভৈরবী।'

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ভাবনার মূলে মানব

অমরেন্দ্রলাল বেরা

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বাতাবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালিত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক ভাবধারার মধ্যে তাঁর কল্প ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি নন, প্রতিভাবান মনীষী। এই মনীষী রবীন্দ্রনাথের মনে পর্বে পর্বে যে ধর্মচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে তার মর্মবস্তুতে কোথাও যে কোনো অলৌকিকতা বা অতিলৌকিকতার স্পর্শমাত্র নেই এবং পরিণামে তা যে 'মানবিক ভূমা'রই নামান্তর অর্থাৎ মানুষেরই ধর্ম : এই হলো আমার প্রতিপাদ্য।

তিনি ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে অন্তরঙ্গ করে উপলব্ধি করেন। রবীন্দ্র মন ও মননের আলোকে আলোকিত বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির ঐক্যের স্বরূপটি অন্বেষণ করতে চেষ্টা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। তিনি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন নিজস্ব বুদ্ধি ও অনুভবের নিকষে যাচাই করে। তাঁর ভারত-সাধনা পরিশেষে বিশ্বমানব সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বেদ-উপনিষদ, মধ্যযুগের সন্তকবি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলে বিশ্বের মধ্যে 'মানবিক ভূমা' কে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্ম-চেতনা গড়ে উঠেছে, যা অন্য আর পাঁচ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চেতনা, যার নামান্তর মনুষ্যের ধর্ম।

<u>প্রথম অধ্যায় : প্রাচীন যুগ আধুনিক যুগ</u>

বিভিন্ন শোকস্পর্শে কবি-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে রবীন্দ্র-চিত্তে এই পর্বেই যথার্থ ভাবে ধর্ম সমন্বয়ের কথা জাগে। এবং তাঁর মানব-কেন্দ্রিক অধ্যাত্ম-চেতনার বিভিন্ন ভাব, সাধন-পন্থা, মতবাদ তাদের সর্বজনীন ভাবে সকল বিপরীত, বিরুদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের সমন্বয় সম্ভব। গীতার অসাধারণ ঐক্যশক্তি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতাকে আত্মসাৎ করে সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়কে একসূত্রে বিধৃত করেছে। পুরাণে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির মূল অভিপ্রায়টি প্রকাশিত। বৌদ্ধধর্ম সর্বজনকে এক মহান ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

নানক-চৈতন্যের মতো কবীর-দাদূ-রজ্জব প্রভৃতি মধ্যযুগের সন্তকবিগণ যে প্রেমধর্মের পতাকাতলে সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন বা হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সহজ ও অপূর্ব মিলন যে হয়েছে বাংলার বাউলগানের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য ধর্মের দিক থেকে আধুনিক যুগে ভারত-পথিক একেশ্বরবাদী রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আন্তরিক ঈশ্বর ব্যাকুলতাই দেবেন্দ্রনাথকে করেছে সমন্বয় প্রবণ; সর্ব ধর্মকে সমানিতভাবে গ্রহণের কথাই কেশবচন্দ্র বড় সুরে গেয়ে গিয়েছে। সকল পথেরই গন্তব্যস্থান যে এক রামকৃষ্ণ তা প্রমাণ করেন, বিবেকানন্দের মানবিক সাধন পথে সর্বমানবের মুক্তি সম্ভব। এ বিষয়ে 'শান্তিনিকেতন', 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'পথের সঞ্চয়', 'আত্মপরিচয়', 'ব্রাহ্মণ', 'সমূহিতা', 'রাজা প্রজা', 'পথ ও পাথেয়' ইত্যাদি গ্রন্থ; 'বাউলগান', 'মানুষের ধর্ম', প্রভৃতি প্রবন্ধ; 'ছিন্ন পত্রাবলী', 'চিঠিপত্র' ইত্যাদি স্মরণীয়।

<u>দ্বিতীয় অধ্যায় : নৈবেদ্য পর্ব</u>

জন্মগত আন্তিক্য বুদ্ধি ও অনুকূল পরিবেশ প্রভাবে বাল্য ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেন তাতেই হয় কবি-মানসে ধর্মীয় সমন্বয় ভাবনার সূচনা। এবং সর্বভূতে ঈশ্বরের মহিমা সন্দর্শনের আন্তরিক অনুভূতির ফলশ্রুতি স্বরূপ নৈবেদ্য পর্বেই তাঁর মানবকেন্দ্রে ঘটে ধর্ম-সমন্বয় ভাবনার উন্মেষ। এই পর্বেই তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করেন, তাঁর একান্ত কাঙ্ক্ষিত বৃহত্তর জীবন-আকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি অধ্যাত্ম-জীবনেই সম্ভব।

<u>তৃতীয় অধ্যায় : গীতাঞ্জলি পর্ব</u>

বিভিন্ন শোকস্পর্শে কবি জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে রবীন্দ্র-চিত্তে এই পর্বেই যথার্থ ভাবে ধর্ম-সমন্বয়ের কথা জাগে। এবং তাঁর মানব-কেন্দ্রিক অধ্যাত্ম-ভাবনার বিভিন্ন ভাব, সাধন-পন্থা, মতবাদ ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সার্থক মিলন ঘটে। এই পর্বেই সর্বপ্রথম তিনি মানুষের ধর্মের সন্ধান পান।

<u>চতুর্থ অধ্যায় : বলাকা পর্ব</u>

বৃহত্তর অভিজ্ঞতার ও চলমানতার পটভূমিকায় ধর্মের যে রূপ এখন কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল তাতে সকল শ্রেণীর পরিপূর্ণতার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কবি বুঝেছেন, এই জগৎ ও জীবন পথিক ভগবানের রথ বিভিন্ন সত্তার বিকাশ মাত্র এবং মানবজীবনের সব কিছুর সুন্দর পরিণাম তিনি।

<u>পঞ্চম অধ্যায় : রক্তকরবী থেকে রাশিয়ার চিঠি</u>

এখন রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন, তাঁর ঈশ্বর অরূপ স্বরূপও এই জগতে—জগতের প্রতিটি অনুপ তথা রূপের মধ্যেই তিনি রয়েছেন। সুতরাং সকল মানুষকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তোলা, কবির মতে, নরদেবের ধর্ম। এখন মানবই তাঁর দেবতা।

<u>ষষ্ঠ অধ্যায় : শেষ সপ্তক</u>

এই পর্বে মানুষই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ; তিনি স্পষ্টভাবে বুঝেছেন, এতদিন তিনি যাঁকে অন্বেষণ করে ফিরেছেন তিনি আর কেউ নয়, মানব। এখন তাঁর কাছে লীলাময়-ভগবান আর মানবাত্মা অভিন্ন।

<u>উপসংহার : সংহত রূপ</u>

সারাজীবনের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন সংক্ষেপে তা হল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী

মানুষের যা কিছু প্রচেষ্টা, যা কিছু চিন্তা-ভাবনা-কর্ম, যা মানুষকে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে তথা 'সোহম্ অস্মি'-র দিকে নিয়ে যায় তাই তার ধর্ম।

চেতনা সজ্ঞা হয়ে ওঠার অধ্যায়-জ্ঞান প্রসঙ্গে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন যে, মানবের অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রম অভিব্যক্তি দানেই ধর্মের যথার্থ সার্থকতা, এর বাইরে তার আর অন্য কোন ভূমিকা নেই, যদি থাকে তবে তা ভুল, মেকী। অভিব্যক্তির চরমে এই মানব-সত্তাই হয়ে ওঠে অসীম, অনন্ত, জ্যোতির্ময়। আর তা-ই পরমাত্মা বা যথার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ।

সুতরাং মানুষের পক্ষে তার কর্মাতিরিক্ত আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য কোন দেবতা বা ঈশ্বর থাকা, না-থাকা দুই-ই সমান।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মুক্তি

বন্দনা রায়

সত্য ও জীবনের সাধনায় নিবৃত্তির পথে নয়,-' নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রহরের আত্ম-অবীকারে', রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দেখেছেন—'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে'। উপনিষদের 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'-এ পৌঁছনোর জন্য 'বিদ্যালয় যজ্ঞশালায় আত্মহোমের বহ্নিজ্বালায়' প্রতিদিনের আমিকে আহুতি দিতে হবে। কিন্তু সেখানেই নির্বাসন নয়, বহু থেকে একে নিত্য হবার পর আবার বহুতে, সীমার রূপে প্রকাশমান হতে হবে। নিরন্তর প্রকাশমানতাই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মুক্তি।

দুটি পথে মুক্তি সাধনা—সৌন্দর্যে, প্রেমে। প্রথম প্রকাশমুহূর্ত থেকে যে অনন্ত সৌন্দর্যবাঞ্ছা বিশ্বপ্রকৃতিতে সঞ্চিত হয়ে চলেছে তার সঙ্গে নিবিড় যোগে সৌন্দর্যসাধনা। 'বনবাণী'র কবিতাগুলিতে ও 'বনবাণী'র ভূমিকাতে এই যোগের কথাই বলেছেন— "বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অবাধ মিলনের বাণীর" মধ্যেই রয়েছে মুক্তির স্বাদ।

জন্মধারার প্রবাহপথে এক অনন্ত সৌন্দর্যময়ী, অপার রহস্যময়ী কবি জীবন-উপকূলে এক দুর্বার আহ্বান করেছে, কবি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সৌন্দর্যলোকে মুক্তির ইঙ্গিত পেয়েছেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর মুক্তিপ্রত্যাশা শান্ত হয় নি, এরপর জীবনে জীবন যোগ করেছেন, মানবের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন—'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে ; মুক্ত করো হে বন্ধ।'

'এই অরূপে আমার মুক্তি অলোয় আলোয়' গানে এই সৌন্দর্য ও প্রেমের সমন্বিত মুক্তির কথা বলেছেন। শুধু বিশ্বপ্রকৃতিতে নয়, 'আমার মুক্তি সবজনের মনের মাঝে, মুখ বিশ্ব তুচ্ছ করা কঠিন কাজে'—মানবের প্রেমের প্রকাশ হল কর্মযোগে।

মুক্তির স্বরূপকে নিজেকে 'নটরাজের চেলা' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে নটরাজ ' নটের খেলায় আপনাকে তার বাইরে খেলায়'—এই বাইরে খেলা হল মুক্তিমন্ত্রে 'ত্যাগের বিত্ত অন্তর নিহিতের প্রকাশমান হওয়া। বলেছেন, 'নাটের আসনে তব মুক্তিমন্ত্র লব',বা গানে ' নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে' বা 'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ'। নটরাজের নৃত্যছন্দে জন্মমৃত্যু, হাসিকান্নার দ্বিরাগপাত্র মেলে, তাঁর বিশ্ববীণার সুরে আপনার সংগীত মিলিয়ে 'মুক্তির সংগমতীর্থ' পাবার আশা করেছেন পূরবীর 'মুক্তি' কবিতায়।

মুক্তির কল্পায় পথ আর পথিকের কথা এসেছে। অকবরের পথ, রক্তকরবী বা মুক্তধারার পথেই মুক্তিনাট্যের পালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'পরিশেষের' 'পান্থ' কবিতায় বলেন, 'চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে', চঞ্চল নটরাজের গানে, নাচে আর 'সর্বভোলা মনে' পথ হয়েছে মুক্তির তীর্থ। 'সেনার তরী' 'মুক্তি'তে বলেছিলেন,

'বিশ্ব জনি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে।'

বিশ্বকে ত্যাগ করে মুক্তির সাধনা নয়, 'বিশ্বসাথে যোগেই তিনি মুক্তির রূপ দেখেছেন। 'চৈতালী'র 'বৈরাগ্য' কবিতার ভক্ত যখন মুক্তির আশায় সংসার ত্যাগ করে তখনই দেবতা তাকে ত্যাগ করেন। বা 'নৈবেদ্য' তে বলেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'।

শান্তিনিকেতন ভাষণমালার সর্বত্র তিনি মুক্তিকে বিশ্বমানবের যোগে কর্মের সাধনে পাবার কথা বলেছেন। বলেছেন সত্য করে দেখা, সত্য করে কাজ আর সত্য করে ভালবাসার মধ্যেই মুক্তি। শান্তিনিকেতন ভাষণমালাতে তিনি বলেছেন, 'আনন্দ বহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে' এই ইচ্ছা হল 'মূলগত-ইচ্ছা' বা 'মঙ্গল-ইচ্ছা' —'আপনি প্রভু সৃষ্টিবন্ধন পরে বাঁধা সবার কাছে', আর 'আত্মার মুক্তি বাহিরের কর্মকে চায়' হল—'কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে স্বর্গ পড়ুক বরে'।

প্রেমে ও কর্মে যোগ যতই নিবিড় হতে থাকে ততই এক পূর্ণমানবের ধারণার মুক্তির অনুভব আসে রবীন্দ্রনাথে। তিনি বলেন পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের যে নিত্যযোগ তা হলে অপূর্ণের পূর্ণের প্রত্যাশা—

'মৃত্তিকার সাথে মিশি
অনুদিন উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
(অপূর্ণ, পরিশেষ)

পূর্ণতার মধ্যে মুক্তির এই প্রকাশের কথা তিনি Religion of Man, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন ভাষণমালাতে বলেছেন।

সৌন্দর্য ও প্রেমের মিলনে মুক্তির এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। উপনিষদের বাণী অন্তরক্ষেত্রে তাঁর ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেও সত্যের প্রকাশেই যে পরমসত্যের মুক্তি এবং নটরাজের চঞ্চলচরণের নৃত্যছন্দেই যে এই প্রকাশ—মুক্তির এই মূলমন্ত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিজতার ভাবর।

রবীন্দ্রনাথ : ক্রান্তদর্শীর চোখে স্বাধীনতা

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

উইল দুরান্ট সাহেব তাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক বই এর উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'ইউ আর দ্য অনলি রিজন হোয়াই ইনডিয়া শুড বি ফ্রি'। কিন্তু কী ছিল স্বাধীনতা-সম্পর্কে সে বাণী। তিনি বলেছিলেন : "পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। স্বজাতীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে।" শুধু তাই নয় সেদিনের স্বাধীনতাও যে একটা 'উল্টো পথ' ছিল—একথা বলতেও কসুর করেন নি তিনি। তাই ১৯০৮ সালের তিনি উচ্চারণ করলেন "স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করবো স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে, এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এ তো গেল সেদিনের রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা। আর সেদিনের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে? সার্ জ্যানিএল হ্যামিল্টনকে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে(১৯৩০) তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি না - ধর্মী কথাই বলেছেন শুধু, হাঁ-ধর্মী বলেন নি কিছুই? —বলেছেন। শুধু বলেন নি, কাজ করেছেন। বলা যায়, উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবনটাই। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন : 'শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীজীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।'।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিল্পবিপ্লবের পরে সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে যেভাবে নগরায়ণ হচ্ছে তাতে ধরণী 'আত' ও 'অস্তচি' হয়ে চলেছে, পরাধীনতার বছরের সভ্যতাবিকাশের লক্ষিক লাঞ্ছিত হচ্ছে। অন্য দিকে গ্রাম হয়ে পড়েছে শ্রীহারা, সঙ্কীর্ণআবদ্ধ। অতিস্ফীত নগর দেশের প্রাণপ্রক্রিয়ায় একটি অস্বাস্থ্যকর আবির্ভাব। একটা উল্টো জন সংস্কৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ি চলাচলের যোগ সেখানে ছিন্ন, মুখোমুখি মানবসম্বন্ধের চিরায়ত অলিন্দ সেখানে লুপ্ত।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্যেও মানব-ইতিহাসের এই প্রেক্ষিতটা রবীন্দ্রনাথের মাথায় ছিল। আর ছিল স্বাধীনতার নানা স্তর সম্বন্ধে সচেতনতা। তাঁর কাছে স্বাধীনতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক—এই তিন রকমের। এই তিনটির মধ্যে কোনটিতে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন বলা শক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর জোর যে সব থেকে কম দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। স্পষ্ট করেই বলেছেন : "ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং আর এক দিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে।'

তাই আর্থিক ও আত্মিক স্বাধীনতার দিকেই তাঁর জোর। দুই-এর মধ্যে সম্পর্কটা, তাঁর কাছে, পরিপূরক না হলেও যথেষ্ট গভীর। প্রথমে আর্থিক প্রশ্ন। বলেছেন : "যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। ..... সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হবে।"

এই কথাগুলির শেষ অংশে খটকা লাগবার মতো একটা ব্যাপার আছে। 'অনেকে' আপন শক্তিকে ধনে পরিণত করলেই 'সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হবে—এই কথায় অনেকের সঙ্গে সর্বসাধারণের কিঞ্চিৎ সরল যোগ কল্পনা করা হয়েছে। সিলাইদহ-পতিসর-কালিগ্রামের পরে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সংগঠিতভাবে স্বাধীনতার ভিত্তিনির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে। আর শান্তিনিকেতনে চেয়েছিলেন আত্মিকস্বাধীনতার ইমারত গড়তে। দুটি চেষ্টাই তাঁর পল্লীসঞ্জীবনের অখণ্ড প্রয়াসের অন্তর্গত।

মৃত্তিকালালিত জীবনে সার্বিক আত্মিক ঠিকানাই ছিল তাঁর লক্ষ্য যার অভাবে, তিনি জানেন, "হাটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে।" 'মোহ-আবরণের মধ্যে অবিদ্যা হয়ে উঠেছে আত্মা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আত্মিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই।

সুতরাং একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল স্বাধীনতার আর্থিক ও আত্মিক দিকটা। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে আর্থিক এবং আত্মিক প্রশ্ন উপেক্ষিত না হলেও প্রায় শুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন অগ্রাধিকার পেয়েছিল তাঁর জীবনাচরণে। তার মধ্যে শাসকের লক্ষণও দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সব মিলিয়ে সে দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা আমাদের নতুন করে ভাবায়। আমরা স্মরণ করি সেই ক্রান্তদর্শীর সতর্কবাণী : "এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে আক্রমণ করলে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।"

চিত্রাঙ্গদা — রক্তকরবী — সে : তিন চিত্রশিল্পীর চোখে

মনিদীপা দাশ

সাহিত্য কর্মের পাশে ছবি থাকলে সাহিত্যে মূল ভাব পরিস্ফুটনে সহায়তা হয় কি? তিনটি বইকে ঘিরে উত্তর খোঁজা যাক — চিত্রাঙ্গদা, রক্তকরবী এবং সে।

যেসব ছবি বর্ণনীয় বিষয়ের দৃশ্যরূপ মাত্র সেগুলির কথা থাক। দেখতে হবে চিত্রশিল্পী কোনো অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত করে দিতে পেরেছেন কি না। ধরা যাক চিত্রাঙ্গদা (১৩৯১, চৈত্র সং) ৪৭ পৃষ্ঠার ছবিটি — মৃত্তিকা প্রোথিত একটি বর্শাকে জড়িয়ে আছে একটি লতা, ঐ বর্শা বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার কাঠিন্যের প্রতীক — আবার ব্রতচারীসুলভ কোমলতাও আছে তার মনে। অপর একটি ব্যাখ্যাও মনে আসে। হর্ষ-অচেতন-বর্ষে এই বর্শা অস্থিন তাই সে লতাজালে আজন্ন। দ্বিতীয় ছবিতে একটি সাপ জড়িয়েছে একটি গাছকে। মদনের কাছে চিত্রাঙ্গদা যে অতুল সৌন্দর্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন — ঐ সৌন্দর্য একদিন নাগপাশে বন্দী করবে তাঁকে — এইটিই ইঙ্গিত।

এ গ্রন্থের বত্রিশটি ছবির মধ্যে অর্জুন মাত্র একটিতে উপস্থিত, সেই একমাত্র মিলনদৃশ্যেও তাঁর মুখ দৃশ্যমান নয়। চিত্রাঙ্গদা সর্বদাই একাকিনী। মিলনের আনন্দময় মুহূর্তে তিনি, অনুভব করেছেন যে অর্জুন আকৃষ্ট তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি — অপমানিতা হয়েছেন তিনি, বলেছেন —

"..... এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে,
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।"

এই শ্রেষ্ঠ-আমির পাশে অর্জুন দাঁড়াননি। তাই কি সন্তরণকালে, কি অশ্বপৃষ্ঠে — চিত্রাঙ্গদা একা। এমনকি, অর্জুনকে আত্মপরিচয়দানকালেও সূর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকল গোপনতার আবরণ উন্মোচন করছেন তিনি শুধুমাত্র অর্জুনের কাছে নয়, বিশ্বের কাছে। এটি চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট অনুভব।

রক্তকরবী নাটকের ছবিগুলিতে বর্ণ-আয়তক্ষেত্র-জাল-সব মিলিয়ে যক্ষপুরী তথা মকররাজের কঠিন্যের ঘোতনা নিয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ। একটি ছবিতে কয়লার মধ্যে সারা আঁচড়ে বাঁদিকে শহরের, ডানদিকে কয়লাসার মানুষের এবং মাঝখানে উদ্যত যন্ত্রদণ্ডের আভাস দেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিতটি যেন এই — যন্ত্রের শাসনে, মানুষের শ্রমে ঐ শহর নির্মিত। একটি ছবিতে বেদি জালের দিকে হাত-বাড়ানো নন্দিনীকে — জালের মধ্য থেকে একখানি সন্তর্পণ বামহস্ত বেরিয়ে এসেছে। কাহিনীর রাজা বলেছিলেন — "জালনার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিয়ো, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রেখো" — নন্দিনী বলেছিল, শুধু হাতটুকু বেরিয়ে এলে তার ভয় করবে। চিত্রে কিন্তু ঐ ভয়ের আভাস নেই — বরং স্পর্শটুকুর জন্য রাজার আকাঙ্ক্ষাটুকু যেন নন্দিনীকেও স্পর্শ করছে। প্রজেশের ছবিতে বেদি কালো ও হলুদ রঙে আঁকা এক বিরাট জাল — নিচে দুটি রক্তকরবী ফুল — লাল রঙেরই দুটি হাত তাদের ধরতে চাইছে। এই লাল রঙের ইঙ্গিত সংগ্রামের — যক্ষপুরীর সঙ্গে নন্দিনীর, মকররাজের রাবণ অংশের সঙ্গে কিঙ্কিণী অংশের। চিত্রশিল্পী এখানে চরিত্রের অন্তরূপনির্মাণ করেছেন।

'সে' গ্রন্থটির শ্রোতা এক নয়-শহরের বস্তিজন যার বিশ্বাসের জগৎ অবস্থিত। ঐ বিশ্বাসের ভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের রেখার ও লেখার নানা চলনের আজগবি ছবির জন্ম হয়েছে। 'হিংস্র ও গম্ভীর ঘটাকর্ণ' 'পাতিসাহদুল' নামের ভূতেরা সবাই জীবিত হয়েছে। চলনধর্মী রেখা দিয়ে এঁকেছেন কর্তিত লাঙ্গল খাসালেজুড়ি শিয়ালের আকুল আর্তনাদকে, হিউমারাস্ হাড়ের দাঁত বার করা খুশিটিকে। দ্বিরদর্মী রেখার অন্তর আঁচড়ে এঁকেছেন পুরুরে অর্ধমগ্ন 'সে'র ছবি — জলের মধ্যে দেহ-ঘুরিয়ে উঠে-আসা অবশিষ্ট 'সে'র চিত্র। এ কি একটি ইঙ্গিত, যে, দেহবিনাশের পরেও কিছু থেকে যায়। মাস্টারমশায় এবং সুকুমারের কাহিনীতে ছোটো গল্পের আবেশ আছে — অঙ্কিত চেতনারাশিও সেই আবেশের পরিপূরক। সুকুমার এক স্বপ্ন-দেখা ছেলে — ছবিতেও তার দৃষ্টি অনির্দেশ্য সুদূরে। মাস্টারমশায় পড়ান এইভাবে — "আমার পড়ানো চলে মেঘের মত শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে কেত — অনুসরে" — ছবিতেও তাঁর এই দ্বিতীয় রূপটি ফুটেছে।

কাহিনী ও চিত্রের সম্পর্ক তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের যোগ্য — ক) ছবি যেখানে কাহিনীর দৃশ্যরূপ মাত্র। খ) ছবি ও কাহিনী পরস্পরের পরিপূরক — ছবির ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণই কাহিনীনির্ভর। গ) কাহিনীর নানামাত্রিক ব্যঞ্জনা ছবিতে প্রকাশিত। এখানে ছবি কাহিনীর সঙ্গী হ'লেও নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রকাশ করে — সে স্বতন্ত্রতা চিত্রশিল্পীরই জীবনবোধের।

অবনীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "শিল্পাশ্রমের নামই হচ্ছে অবেলানী, যেখানে শিল্পীরা একত্র হয়ে রসে রস পরিবেশন করে।"

পরিবেশিত সেই মিশ্ররসের আস্বাদ এই বই-তিনটিতে পাই আমরা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রূপকথা-শিল্প

সুমিতা দাস

P3041

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় অথবা গানে চোখে পড়ে রূপকথার অনুরাগ। আসলে, রূপকথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কৌতূহল ছিলই, এর কারণ, একদিকে শৈশবস্মৃতি, অন্যদিকে রূপকথার লিখিত রূপের প্রতি আকর্ষণ।

ছিন্নপত্রাবলীতে রূপকথার উল্লেখ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অজস্র, অবিরল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুনের চিঠিতে দেখা যায়, কবির মন থেকে বৈজ্ঞানিক জগৎটি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ নিয়ে জেগে উঠছে বাপসা রূপকথার জগৎ। ২০ জুনের চিঠিতে 'চারিদিক' কত অনায়াসে হয়ে ওঠে 'পরীস্থান', আর, ওই বছরেই অক্টোবর মাসে লেখা একটি চিঠিতে নির্জন নদী আর চরভূমিকে কবির মনে হয় যেন 'গল্পের তেপান্তরের মাঠ' এবং 'দাত সমুদ্র তেরো নদী' 'ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে'। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুনের চিঠিতে লিখেছেন :

'কেন হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধবাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে হত, ভূত্য-শাসিত আমি তোষামোদের মধ্যে চুপ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধবাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে অসম্পূর্ণ ছবি মনের মধ্যে জমেছিল সেটা যেন এখনও বেঁচে আছে — ঐ বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্সন্-ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীরে এবং মাঠের প্রান্তের ধূসরশূন্য দেখে ঠিক এমনভাব মনে উদয় হত না — সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর একরকম হয়ে যেত।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বরের চিঠিতে আছে, শীতকালের 'শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন' দেখে কবির মনে পড়ে গ্রীমভাইদের রূপকথা 'হানসেল অ্যান্ড গ্রেটেল'-এর স্মৃতি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বরের চিঠিতে দেখা যায়, শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় সীমাহীন চরভূমিতে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে পড়ছে ছেলেবেলায় ঝিনুকটি দাসীর কাছে শোনা রূপকথার স্মৃতি : 'তেপান্তর মাঠ — জোছনার ফুল ফুটে রয়েছে।'

ওই একই চিঠিতে পাওয়া যায়, 'জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ' জেগে ওঠার কথা, তখন 'চারিদিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা কিছু অসম্ভব সেই গুলোই আমার ধারণ করে ওঠে।' এখানেও রূপকথার স্মৃতির আভাস জাগছে কবির মনে।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায় ও গানে আমরা রূপকথা শিল্পের প্রকল্প লক্ষ্য করবো। বিভিন্ন কবিতায় ও গানে কি ভাবে রূপকথার মোটিফগুলিকে ব্যবহার করেছেন তিনি, কি ভাবে তাঁর collective unconscious — এ রূপকথার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কিভাবে হয়তো অজ্ঞাতসারে, তা উপমায় উল্লেখে, রূপকে ইমেজে রূপায়িত হয়েছে কবিতায় ও গানে — তাকেই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস রয়েছে এই রচনায় যে জগতে বিষাদী পৃথিবীর নিষ্ঠুর হিংসাদী দ্বন্দ্ব একেবারেই পরিত্যাজ্য, যে জগতে ভৌগোলিক পৃথিবীর মানচিত্রেরেখা কোনোমতেই প্রাহ্য নয় — রূপকথার সেই হারিয়ে-যাওয়া জগতের ঠিকানা জানেন কবি। 'স্বপ্নলোকের চাবি' হাতের মুঠোয় ধরা আছে তাঁর। আর তাই দেশ কালের ভেদাভেদ না মেনে মুহূর্তে ভরে তাঁর রচনায় তুলে নেন দুই ভিন্ন দেশের সমুদ্র আর পক্ষিরাজের ডানার আভাসে বাংলাদেশের রূপকথার কবিতায় অথবা গানে অনায়াসে উঠে আসে মধ্যেকন্যার কেন রূপান্তরের করুণ কাহিনী — যার মূলে থাকে আছে রসেনের রূপকথার স্মৃতি, কিংবা গ্রীমভাইদের 'স্নোহোয়াইট' কবি-কল্পনায় ফিরে আসে 'বিষবতী' রূপে।

কিংবা ধরা যাক, 'দুই পাখি' কবিতা। 'সোনার খাঁচার পাখি'তো স্পষ্টতই রূপকথার বিহঙ্গবাসী। বনের পাখিও তাই। মনে পড়ে, হান ক্রিশ্চিয়ান আন্ডেরসেনের রূপকথার সেই-বাল্যিক পাখির গান বন্ধ হয়ে যেতে অসুস্থ রাজপুত্রের কাছে গান গাইতে ফিরে আসা মুক্ত পাখির গল্প।

কবি বনের পাখিকে বেঁধেছিলেন তাঁর প্রাণের গানের ভাষা তারা শিখবে বলে। কিন্তু তারা উড়ে গেল। তারপর আবার পরিত্যক্ত 'সোনার খাঁচা' যখন দিনান্তের 'ধূসর গোধূলির' ম্লান স্মৃতির রাঙ্গা আলোয় 'ভাঙ্গাখাঁচা' হয়ে গেছে, তখন তারা ফিরে আসে। "ওরা কি সব হারার পাখি"? রূপকথার ফুলকুলও অবশেষে ফিরে এসেছিল।

মানুষের অর্ধনারীশ্বর সত্তার যে 'দুই - আমি' : একটি মুক্ত পাখি, আরেকটি বদ্ধ পাখি — এ তো তাদেরই লীলা। প্রথমে 'মুক্ত পাখি' পালিয়েছিল, তারপর আবার তার আগে ফেরে' তাদা খাঁচার চারপাশে। সে কি 'বদ্ধ পাখি'ই নয় — যার মধ্যে সেই দিনগুলি আজও সঞ্চিত আছে তাদের সজীব মাধুর্যে। একজন ফেলে চলে যায় "চপল আমি বনের পাখি বনে পালায়" আর, অন্য জনে বসে থাকে, ফিরে ফিরে ডাকে — সেই রূপকথার অতীত পাখিকে এভাবেই কতদূরে নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'মধুর সে ক্ষয় নাই তার'

নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'আমার সে ভালবাসা/সব ক্ষয় ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।' বিশ শতকের দশকগুলি ক্ষয়-ক্ষতিতে ঘটনাবহুল, যত চলমান, পরিবর্তনশীল ততই আধুনিক, আধুনিকতর। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জলযাত্রা কিন্তু ক্রমশই চলে হয়ে উঠছে বোধের গভীরে। অন্তত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে, রবীন্দ্রনাথকে শীর্ষচ্যুত করা হবে! না মুখ্যুটমণি করা হবে। আর এর মধ্য থেকেই কবির সত্তা প্রমাণের আপন বেগে সংস্কৃতির মূলস্রোতে পৌঁছে যায় রসিক পাঠকের অনুভূতির অন্তর্লোকে, সেখানে মানস-প্রক্রিয়ার অন্ত গুঁড় লগ্নে কবিতা রসিককে বাজায়। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন "বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাপিত করতে জানে।" কবিতা যে শেষপর্যন্ত "সহৃদয় হৃদয় সম্বাদী" তা পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিতে, পাঠকভেদে নানারকম revelation এ প্রমাণিত।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগের দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যে সব কবিরা তাঁদের স্পর্ধিত তারুণ্যে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছিলেন দূরে, তাঁরাই অনায়াসে ফিরলেন রবীন্দ্রঅনুরাগে। চল্লিশের দশক রীতি-প্রকরণ ও বিষয়ে বিভিন্ন ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা — নৈরাশ্য ও রোম্যান্টিক ভাবাবেগে। পঞ্চাশের কবিতাও রাজনৈতিক ধারাকে বহন করে বুদ্ধিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ষাটের দশকের শেষের দিকে নকশাল-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসহিষ্ণু আত্মানুসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পর সত্তরের কবিতায় ফিরে এল প্রকৃতি এবং সহজ সরল মৌল স্বভাব। রবীন্দ্রনাথও বিচরণ করেন বাগধারায়, প্রতীকের সঞ্চারে অনুভূতির অনতিক্রম্য সাযুজ্যে। কি অবলীলায় তিনি মিশে গেলেন রোমান্টিকের ভাবনায়, সনাতন-মনস্ক রাজনৈতিক কবিতায়, প্রকৃতির অন্তর্লীন আবাহনে, অন্তর্মুখীনতায় এবং অবচেতন মানসের বাঙ্ময়রূপে। আমরা লক্ষ্য করলাম যখনই প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে তখনই রবীন্দ্রনাথের বাণীবদ্ধ শব্দ অনুপম-সাম্প্রতিক কালের কবির কাব্যশরীরে সঠিক অবস্থানটি খুঁজে নিচ্ছে। যখনই বিষয়বস্তুর চুম্বক প্রতিফলনে প্রতীক প্রয়োজন হচ্ছে নামকরণে তখনই রবীন্দ্রনাথ বিকীর্ণ হচ্ছেন স্বমহিমায়। এই প্রবণতাটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার অনুসন্ধান আহ্বান করে যখন আমরা দেখি সত্তরের দশক থেকে এই যশ নব্বই-এ কত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক রচিত হয়েছে যার শীর্ষনাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের ভাষাংশ নিয়ে। তালিকা দিতে চাইলে একটি দীর্ঘতালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব।

এই প্রবণতার সঙ্গেই আত্মকরণের পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পঙ্‌ক্তি আজকের কাব্য শরীরে যুক্তায়িত হয়। যা ভিন্নস্বাদের গৌরবের সঙ্গে রবীন্দ্রবোধেও আমাদের আলোড়িত করে, স্পন্দিত করে। 'Words that have become deeds' শব্দেরই কীর্তিমান অনুষঙ্গে কবির অনুভূতির সঠিক বিশারী হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিকের সকল জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতায় জয় যখন আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার একটি দলিল প্রকাশ করেন, একটি মেয়ে এই পরতন্ত্রের যুগেও তার প্রেমাস্পদকে হারিয়েছে status বা শ্রেণীবিভাজনের জন্য। মর্মান্তিক ইঙ্গিত থাকে কবিতায় সে হারিয়ে যেতে পারে চোরা পথের বাঁকে তখন ফেলে আসা প্রেমের অপরিমেয় মূল্যবোধ একটি অন্ত্য স্বরাঘাতন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করার জন্য জয় সব প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে।

"ঘুমে আঁখি ঢুলে তবু ছুটেছে মরালী
সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি।"

জয়ের কবিতায় যে অবলম্বিত জগতের শব্দরূপ ধরা পড়ে, তাকেই সঠিক প্রকাশ করতে তিনিই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথকে। নামকরণে, অনুপুঙ্খ কল্পনায়, প্রতীক ব্যবহারে, সর্বোপরি আত্মপ্রতিষ্ঠায়। এ ধারা কিন্তু চলে মনের গভীরে আত্মীকরণের পদ্ধতিতে। কে জানায়, হে বৈশাখে' কবিতায় জয় 'না-বলা বাণীর ঘন বরষিনীর' অস্পষ্টতা থেকে তুলে এনেছেন শব্দ। "কেউ কি বিষ ছুঁইয়ে দেয়, রৌদ্রদিন/বৃষ্টিদিন ঘুমিয়ে দেয়, — একটি শোক/ঘুরে বেড়ায়, মিলিয়ে যাওয়া এক বালক/এই পথেই ঘুরে বেড়ায়, ধরে বাতাস/শুকনো ঘুচোয় সে উড়ে যায়।" একটু পরেই আবার জয় বলছেন — "রৌদ্র নিয়ে বৃষ্টি নিয়ে প্রতিবছর/সবার চোখ আড়াল নিয়ে, প্রতিবছর/কে জন্মায়।" সবার চোখের আড়ালে আজকের Malady of the age -কে ছুঁয়ে ফেলাটাই বা কবিকর্মের মত তাঁকে যাঁরা অনন্যচেতনায় অনিরূপিত মেতে পৌঁছে যান রবীন্দ্রনাথ মুকুরে কবিতে, ভাষায় কবিতে, নির্মাণের কবিতে। একেবারেই এই প্রজন্মের কবি' যায় ১৬ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় যখন দেখেন 'এ বাঁশি তোমার' (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) —

(যে বাঁশি বাজিয়েছিলে তুমি/বৃন্দাবনী তীরে,/সেই বাঁশি আজও শুনি।
সেদি আজও দুটি চোখ অভিসারে/চায় চেয়ে।/একটির আজও জন্মে, যেমন জন্মত তখন/উঠেছি শুধু একটুই, মরা বেড়ালের ছানার পালে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে মরা মানুষের ছানা।)

তখন আমরাও অনুভব করি, বাংলা কবিতার মূল-বাঁশিটি রবীন্দ্রনাথের হাতেই—'মধুর সে ক্ষয় নাই তার'।

পলাতকায় নারীমুক্তি

স্বাতী সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবিষ্ঠিতে। নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা ও মুক্ত জীবনবোধ [illegible] করেছেন চিত্রাঙ্গদা, সুচরিতা, অনিলা এবং এইরকম আরো অনেক অসাধারণ চরিত্র। আত্মোপলব্ধির মহিমায়, প্রখর ব্যক্তিত্বে এরা উজ্জ্বল ও অনন্যসাধারণ।

বিশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌঁছেও আমরা দেখতে পাই নারীর অনাদর ও অবহেলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানবতার মাঝখানে নারীকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'ভারতী'র 'আত্মপ্রকাশ' (৬ মাঘ, ১৩০৮) কবিতার প্রারম্ভেই বলেছেন :

"মুক্ত হও হে সুন্দরী!
স্থির করো রঙ্গিন কুহেলী।
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।"

নারী তার সকল কুণ্ঠা কাটিয়ে নিজের গৌরবে যখন প্রকাশিত হবে, যেদিন সে আত্ম-পরিচয় আবিষ্কার করবে তখনই তার মুক্তি। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী মুক্তির কথা নানা ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যেও কয়েকটি নারীকে ঘিরে মুক্তির কথা বলেছেন। এদের সবার জীবনে মুক্তি এক ভাবে আসেনি। মর্ত্যলোক থেকে মৃত্যুলোকে মুক্তি পেয়েছে শৈল, ঝিনু ও 'মুক্তি' কবিতার নায়িকা। নন্দরানী ও মঞ্জুলিকার মুক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

'চিরদিনের দাগা' কবিতার শৈল বা 'কালো-মেয়ে' কবিতার নন্দরানীর মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই। তিন বিঘার পরে চতুর্থ কন্যাশৈল 'জননীর স্বপ্নে' সে হলো 'অবজ্ঞিত কাঙাল'। প্রতিবেশী বৃদ্ধদাদা ছাড়া তার সকলের কাছেই সে অনাদৃতা। মানুষের সংসারে যার আদর হলো না, মৃত্যু তাকে মুক্তির কোলে টেনে নিল। শৈলর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদেরও মানস-মুক্তি আনতে চেয়েছেন।

কালো মেয়ে নন্দরানী পরিজনদের কাছে এক মহাসমস্যা— "বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ"। ঠিক তখনই বাড়ির কাছে মেঘের ডমরুটির হুঙ্কার জুড়ে পড়তে থাকে নন্দরানীর ঘুমঘনির ঘায়। কালো মেয়েকে গঞ্জনা আর অবমাননা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিলেন প্রেমিকের প্রেমে। 'মুক্তি' কবিতার নায়িকার ন বছর বয়সে বিয়ে হয়। বাইশ বছর ধরে সে লক্ষ্মী গৃহবধূ, গৃহকর্মে বাঁধা :

"রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকতেই বাঁধা।"

সে পেয়েছে অন্ন সুখ্যাতি, কিন্তু নিজেকে পেয়েছে কি? মনের ইচ্ছায় সে তার আনন্দ, সুখ-দুঃখ ভুলেছে, তার অসাড় মনের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে কত বর্ষা বসন্ত। বিধিদত্ত ও অনুভূত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন এই জীবন তাকে ক্লান্তি আর শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে তার আত্ম-আবিষ্কার ঘটলো। সে উপলব্ধি করলো গৃহদীপের অগ্নিশিখা বন্দী নারীজীবন, অসার্থক, স্বাপন সুখ-দুঃখকে মূল্যহীন করে রাখলে বড় হয়ে ওঠে আত্মবঞ্চনা। নবজাগ্রত আত্মবোধে নারীর ভূমিকা ও মহিমা তাকে গৌরবান্বিত করে : "আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণার নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত ফাগুনে ফুল ফোটা।"

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল তাকে মৃত্যুলোকেই মুক্তি দিয়েছেন তা নয়, মৃত্যুর পূর্বে নারীসত্তার গৌরব ও মহিমা আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই তার মানসিক বন্ধন ও জীর্ণ জীবন থেকে মনের প্রকৃত মুক্তি এসেছে।

গৃহবধূ ঝিনু ('মুক্তি') গৃহ জীবনেই ছিল বাঁধা। অনুভূতির সূত্রে হাওয়া বদলের জন্য সে পা রাখলো বহির্বিশ্বে এবং তার মন [illegible] পুলকিত। তার চেয়ে বয়সের জীবনে পরম মূল্যবান শুধু দেহ মুক্তি নয় যা তাকে প্রেম ও আনন্দে মুক্তি দিয়েছে।

'নিষ্কৃতি' কবিতার মঞ্জুলিকার মা মৃত জীবনবোধের অধিকারী। তাই কৌলীন্যের সংস্কার ভেঙে পুলিনের সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছেন। লোক-নিন্দা, সামাজিক জীর্ণতা ভেঙে বিধবা মঞ্জুলিকার দ্বিতীয় বিয়ের কথা উচ্চারণ করেন। মঞ্জুলিকা গৃহকাজ ও পিতৃসেবার পাশাপাশি [illegible] সেবা পালন করে। এরই মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে তার তরুণী মনে প্রেম এলো। সমাজ ও পিতার নিষ্ঠুরতা, মায়ের দুঃখবরণ ও নিজের প্রেম [illegible] জীবনবোধে গড়তে সাহায্য করেছে। তাই লজ্জা ও জীর্ণ সংস্কার ভেঙে 'অপরিণী' মঞ্জুলিকা পুলিনের সঙ্গে আত্মদানকে বরণ করে নেয়। জীর্ণ-জড় প্রথাবদ্ধ জীবন [illegible] নিষ্কৃতি। 'ভারতী'র 'সমস্যা' (২৩ আশ্বিন, ১৩২৮) কবিতা যে প্রশ্নে শুরু হয়েছে, তার উত্তর রবীন্দ্রনাথ এই সব মঞ্জুলিকাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত' নারী

সোহিনী ঘোষ

আজকের নারীবাদীরা নারীর মুক্তি'র বিষয়ে প্রধান শর্ত হিসেবে রেখেছেন দুটিকে — (১) অর্থনৈতিক সমানাধিকার এবং (২) নারীর শিক্ষা। সংশয় জাগে, এই দুটোই, যদিও জনপ্রিয়তম স্লোগান, তবুও নারীর মুক্তির কি প্রধানতম হাতিয়ার হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে ভেবে গেছেন 'মুক্তি'র কথা। আমাদের যে বদল আজকের নারীবাদীরা চাইছেন, রবীন্দ্রনাথ তার শেষটা ভেবে নিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনি জানতেন নারীর চিন্তার মুক্তি না ঘটলে, ব্যক্তিত্বকে স্বস্থানে প্রকাশ করতে না পারলে, শুধু 'কমলা' লিখে বা যোগপরিধি অর্থে নিজের অন্নসংস্থান করতে পারলেই 'মুক্তি' ঘটবে না।

মাত্রই দুটো গল্প আর দুটো উপন্যাসকে রবীন্দ্ররচনার মহাসাগর থেকে তুলে আনলে এই বক্তব্যের কিছুটা সমর্থন হয়তো পাওয়া যাবে। ১৩০৮ থেকে ১৩৪৮, চল্লিশ বছর ধরে ছড়িয়ে আছে এই নির্বাচিত বারোটি গীরকখণ্ড।

১৩০৮	— বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ	নষ্টনীড়	চারু
১৩০৯		চোখের বালি	বিনোদিনী, আশা
১৩১৪		গোরা	ললিতা
১৩২১	জ্যৈষ্ঠ	হৈমন্তী	হৈমন্তী
১৩২১	শ্রাবণ	স্ত্রীর পত্র	মৃণাল
১৩২১	কার্তিক	অপরিচিতা	কল্যাণী
১৩২১		চতুরঙ্গ	দামিনী
১৩৩৪	ভাদ্র — চৈত্র	শেষের কবিতা	লাবণ্য
১৩৩৯	অগ্রহায়ণ — ফাল্গুন	দুই বোন	ঊর্মিলা
১৩৪১		চার অধ্যায়	এলা
১৩৪৭		ল্যাবরেটরী	সোহিনী
১৩৪৮		বদনাম	সবু

রবীন্দ্রনাথের নারিকাদের একটা ক্রম-উত্তরণ আছে। ছোট বারোটি কাহিনী বিশ্লেষণ করলে কিছুটা বোঝা সম্ভব হবে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক-চিন্তার নিজস্ব একটা প্রকাশ আছে। প্রেম নারিকাদের কারো জীবনে আসতে পারে, না আসতে পারে, প্রেমের পাত্র স্বামী না হলেও চলে এবং এজন্য তারা অপরাধবোধে আক্রান্ত হয় না। তারা একটা নিজস্ব বোধে স্থিত।

রবীন্দ্রনায়িকারা কখনও ঘর থেকে বাইরে গিয়ে মুক্তি খোঁজে (স্ত্রীর পত্র), কখনও সততার নির্মম শাস্তি হয় (হৈমন্তী), কখনও নিজের সিদ্ধান্তের ভালো-মন্দ ফল নিজেরাই ভোগ করে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় (ললিতা-গোরা, এলা-চার অধ্যায়, লাবণ্য-শেষের কবিতা, ঊর্মিমালা-দুইবোন), তারা কখনও পুরুষের দ্বন্দ্বরূপ হয়েছে (কল্যাণী), কখনও তারা প্রেমকে অন্য মাত্রা দিয়েছে (চারুলতা, দামিনী, লাবণ্য, সোহিনী)।

বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে, মনকে যথেষ্ট প্রসারিত না করলে মেয়েদের সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়। চিন্তার মুক্তি এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস — এই দুটিই রবীন্দ্র-নায়িকাদের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধির মুক্তি ঘটলেই বদ্ধ সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটবে — এই ধারণাই রবীন্দ্রনাথের ছিল।

'কল্পনা' : রোম্যান্টিক স্বপ্নচারণার রবীন্দ্রভাষ্য

শ্রীনান্দী সিংহ

রবীন্দ্র প্রতিভার বহুকৌণিক ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল স্ফুরণ তাঁর কাব্যের রোম্যান্টিসিজম। রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের অতীত স্বপ্নচারণার বাণীরূপ — 'কল্পনা' কাব্য। আমার আলোচ্য বিষয়ের শীর্ষনামকে ভেঙে যে তিনটি শব্দ পাচ্ছি — সেই 'রোম্যান্টিক', 'স্বপ্নচারণা' ও 'রবীন্দ্রভাষ্য' — এদের একটু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট করতে চাই।

'রোম্যান্টিক' শব্দটি এসেছে ইংরেজী রোম্যান্টিসিজমের পথ থেকে — ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Lyrical Ballad প্রকাশের মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ ছিলেন এই পর্বের পথিকৃৎ। ব্যক্তিমনের গভীর অনুভূতি ও অস্পষ্ট বেদনার আভাসে রোম্যান্টিসিজম এক করুণ মায়াবীতে পূর্ণ। এ কবিতায় চলে অন্তরের সন্ধান, এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা — যা কোনও দিন সফল হয় না, তাই এর অনিবার্য ফলশ্রুতি বেদনা ও বিষণ্ণতা। Mario Praz 'The Romantic Agony' গ্রন্থে বলেছেন —

"All through the literature of Romanticism, down to our own times, there is an interpenetrability of pleasure and pain."

• অপ্রাপনীয়কে পাওয়া ও অধরাকে ধরার অসম্ভব কামনার কথা ও বেদনাই রোম্যান্টিক কবিতায় অঙ্কিত — যার সার্থক নিদর্শন পেয়েছি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস ও বায়রনে। সুদূরের জন্য আকুলকরা কামনা রোম্যান্টিকতার অনিবার্য লক্ষণ। এই জন্যই রোম্যান্টিক কবিরা অতীতে অভিসার করেন। হাইনরিখ হাইনে বলেছেন — Romanticism is the reawakening of middle ages — অর্থাৎ মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ। এই সূত্র ধরেই দূরাগত চেতনার কথা এসে পড়ে। বিস্ময়রস রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য। প্রেম ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যেমন এই বিস্ময় জাগ্রত হয়, তেমনই বিস্ময় জাগে অতীত সৌন্দর্য অনুভবে। সে যুগ কবেকার কেটে গেছে, সে রাত কবে হারিয়ে গেছে। বর্তমান জগৎ থেকে কবি মানসসঞ্চিসারে যাত্রা করেন অতীত সৌন্দর্যলোকে — অনুভূতির গভীরতাই এই স্বপ্নচারণার উৎস।

এই রোম্যান্টিক মনোভঙ্গীর স্বপ্নচারণার কাব্য ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্য। পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক ধারার অতীতচারিতায় কবির মনে ধরা পড়ে কালিদাসের যুগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কল্পনা মিলে যায় রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে। রোম্যান্টিসিজম, যার উৎস ইংরেজী সাহিত্য — তার স্বপ্নচারণার বৈশিষ্ট্য মূর্তি পায় অতীত ভারতের কালিদাসের কাব্যে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল কবিসত্তার বিকাশে 'কল্পনা' কাব্য গড়ে ওঠে — তা হ'য়ে ওঠে রোম্যান্টিসিজমের রবীন্দ্রভাষ্য।

স্বপ্নসম্ভব বাণীচিত্র 'কল্পনা' যেন প্রাচীন ভারতের চিরবসন্তময় সৌন্দর্যপুরীতে প্রবেশের দ্বার — অনুভূতি ও কল্পনার যাদুস্পর্শে যার আবরণ হয় উন্মোচিত। এ কাব্যে পাই কবির কালিদাসচিত্রতা ও মধ্যযুগমুগ্ধতার পরিচয়।

'কল্পনা' কাব্যের চারটি কবিতায় কালিদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। মেঘদূতের প্রত্যক্ষ প্রভাব — 'স্বপ্ন', কুমারসম্ভবের প্রভাব 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' এবং ঋতুসংহারের প্রভাব 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়।

'স্বপ্ন' কবিতার কাব্যদেহে রচিত হ'য়েছে কালিদাসীয় বাতাবরণ। এর 'স্বপ্নলোকে শিপ্রানদীপারে উজ্জয়িনীপুরের' বর্ণনা মুহূর্তেই আমাদের নিয়ে চলে কালিদাসের কাছে, মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপট হয় উদ্ভাসিত। আমাদের মনে আসে কবি কীটসের প্রাচীন গ্রীসকেন্দ্রিক অতীতচারণার কথা, যা Hellenism নামে সাহিত্যে খ্যাত।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগ ও মেজাজকে নিখুঁত বর্ণনায় ফিরিয়ে আনেন। কোলরিজ ও কীটসের কবিতায় যেমন Removal of time হয়েছে, এখানেও তেমনই লক্ষ্য করি সময়ের অপসারণ। আজন্ম বর্ষার পরশভারে কবিচিত্ত হারিয়ে গেছে প্রাচীন সৌন্দর্যের অমরাবতীতে — মানসলোকে ভেসে উঠেছে "কুটজপাতায় নবনীতরচনার" ছবি।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের ভাবমর্ম নিয়ে রচিত কবিতাযুগল 'মদনভস্মের পূর্বে' ও মদনভস্মের পরে'। প্রাচীন ভারতীয় কালের কাহিনীসূত্রে বিশ্বলোক ও শিবলোক একই সঙ্গে অঙ্কিত হ'য়েছে। প্রথমটি যেন সম্ভোগ রসের ও শেষেরটি বিপ্রলম্ভরসের কবিতা। একটি আনন্দ উল্লাসের ছবি, অন্যটি আনন্দবেদনার গান।

রোম্যান্টিক এই অতীত চারণাকে অনেকে বলেছেন — পলায়নী মনোবৃত্তি। কিন্তু এ পলায়ন তো জীবন থেকে জীবনেরই অপর অংশে, সত্য থেকে সত্যের অন্যতর রূপে, সৌন্দর্যের স্বপ্নলোকে। স্বপ্ন যেখা জীবনেরই ধর্ম। মনোলোকের অনুভবই তো কবিতার উৎস। সত্যের সঙ্গে মিশে সত্যেরই কেবল বাস্তব — নিজস্ব নির্জনে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ কি বাস্তব নয়?

বাস্তব আয়ত্তে অতিবিজ্ঞ জীবনবাদবিদ শেলী তাই উচ্চারণ করেছিলেন —

"I fall upon the thorns of life
I bleed"

তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেন — 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে' তাই তো আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বিশ্বপ্রকৃতির অনুভব হ'য়ে দেখা দেয় তাই দুঃখবেদনার অনুভব হ'য়ে ওঠে কবিতা। আর তাই দুঃখ অনেক সময় হয় সুখেরই অন্য নাম, তাই রক্তকরবীর বিশ্বপাগলের মুখে রবীন্দ্রনাথ আনেন —

'এমন দুঃখ আছে, যাকে ভোলার মত দুঃখ নেই' — তাই রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রোম্যান্টিক কবিতা আমাদের পুনরাবৃত্ত রসনার প্রিয়তম হ'য়ে বারবার ফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাটকের কয়েকটি রাজা চরিত্র : কিছু চিন্তা

বিভাবসু দত্ত

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ নাট্যপথপরিক্রমায় যে কয়েকটি চরিত্র বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, 'রাজা' চরিত্রটি তাদের মধ্যে অন্যতম। এই রাজা চরিত্রটি কখনো মানুষ আবার কখনো বা প্রতীকরূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন নাটকে স্বতন্ত্ররূপে, ভিন্নতর অর্থ নিয়ে ধরা দিয়েছে — যার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্বিক চিন্তা ও নিজস্ব জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'রাজা ও রাণী' (রূপান্তর : 'তপতী'), 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'রাজা' (রূপান্তর : 'অরূপরতন') — নাটকগুলি অবলম্বনে রাজা চরিত্রের এক গভীর মালা গেঁথে এর ভিতর দিয়েই দেখব রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ভুবনটি।

'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯)-র রাজা বিক্রমদেবের কাছে রাজকর্মের পরিবর্তে স্ত্রীর প্রতি মোহময় ভালবাসাই হল সত্য। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে রাণী যখন পথে বেরিয়েছেন তখন রাণীকে সহজভাবে না পাওয়ার গ্লানি থেকেই তাঁর "আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।" 'তপতী' (১৯২৯)-তে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তাঁর শক্তির দম্ভ। এই চরিত্রের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি ভাবনা মেলে : (১) প্রেম হল কামনাহীন, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবোধের দ্বারাই তাকে লাভ করতে হয়। (২) রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যকে সর্বদাই গুরুত্ব দিতেন। যেখানে মানুষ কর্তব্যচ্যুত সেখানে মানুষ খণ্ডিত। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকের রাজা গোবিন্দমাণিক্য উদার প্রেমধর্মের অধিক। ধর্মের নামে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন ঘরে বাইরে। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হিংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় গোঁড়া সংস্কার যে আমাদের ক্রমশঃ অন্ধতার দিকে নিয়ে যায় দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হরার মানুষ", সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। ধর্ম নিয়ে দাদা আর যৌলবাদীদের আস্ফালনে ক্ষতবিক্ষত বিশ্বে এই চরিত্রটি আজও বড় বেশী প্রাসঙ্গিক। 'মুক্তধারা' (১৯২২)-র রাজা রণজিৎ ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬)-র রাজা নন্দিনী — চরিত্রদুটির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টিকে (World-Vision) লক্ষ্য করি। এই দুই রাজা যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিনিধি। যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতার পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রনীতি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে তাদের ভাবনা-চিন্তা ও শোষণ—সবই উঠে এসেছে এদের মধ্যে। রাজা চরিত্র দুটির ভিতর উন্মোচন দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই অন্তঃসারশূন্য যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতার পতনের কথা বলেছেন তিনি। আজও সারা পৃথিবীতে এরা বর্তমান, তাদের পতন নিশ্চিতভাবেই কাম্য। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের বিশ্বাসের কথাটি ফুটে উঠেছে 'রাজা' (১৯১০) বা 'অরূপরতন' (১৯২০)-নাটকের রাজা-র মধ্যে দিয়ে, যদিচ এই নাটকটি আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যপর্বে এসেছে। রাজা চরিত্রটিকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করলে তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় ভক্তজনের মধ্যে। এই নাটকটির মধ্যে গণতন্ত্রের কাঠামো এবং রাজার মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতার গুণ আবিষ্কার করা গেলেও, এর দ্বারা সমস্ত নাটকটি ব্যাখ্যা করা যাবে না। আসলে রাজা হল 'সত্য' (Truth), তা বিমূর্ত তাই অরূপরতন। এই 'সত্য' সর্বদা মনোহর নয় — এর মধ্যে সুন্দর, কুৎসিত, মধুর, ভয়ংকর, দুঃখ, মরণ সবই মিলে আছে, আর এই 'সত্য'-কে শেষ পর্যন্ত 'আনন্দ' বলে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। "সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম"—রবীন্দ্রনাথের এই অন্তিম উচ্চারণ এই নাটকের ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে ওঠে, একটি নতুন অর্থবোধে পৌঁছিয়ে দেয় আমাদের।

'যোগাযোগ' -এর বিতর্কিত সমাপ্তি

লিলি দত্ত

'যোগাযোগ'-এর উপসংহার অংশটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এমন-কী মৃত্যুর পরেও কিছু সমালোচনার শেষ নেই। শ্রীকুমারবাবু এই প্রসঙ্গে অনেকটি প্রশ্ন তুলেছেন। কুমুদিনী কোথায় ফিরবে? মধুসূদন কি শ্যামার কলুষিত আসনের আর এক পাশে তার অবহেলার আসন নির্দিষ্ট করে দেবে, না-কি স্ত্রীর চেয়ে আসন্ন জননীত্বকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে? কুমুদিনীই বা মধুসূদনের স্ত্রী এবং ঘোষাল বাড়ির উত্তর-পুরুষের গর্ভধারিণী এই দুই সত্তার মধ্যে কী-ভাবে সমন্বয় করবে? তাই শ্রীকুমারবাবুর মতে — 'এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াই উপন্যাসটির অতর্কিত পরিসমাপ্তি আর্টের দিক দিয়া একটা গুরুতর ত্রুটি বলিয়াই ঠেকে'। পরশুরামও সন্দেহে বলেছিলেন — শেষে লেডি ডাক্তার এসে কুমুর সমস্যা সমাধান করে দিয়ে গেল। অর্থাৎ সকলেই অভিযোগের তর্জনী তুলেছেন।

১৮৭৯-তেই ইবসেনের নোরা স্বামী-সন্তান পরিবৃত পুতুলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। ঘটনাটির প্রতিক্রিয়ায় জার্মানের মহান সাহিত্যিক লু সুন প্রশ্ন তুলেছিলেন — ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নোরার পার্সে ছিল ঠিক কত টাকা? অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি অতঃপর হয়ে উঠবে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কুমুদিনী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর ঘরে ফিরবে না মনস্থ করেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভেবেছিল বাকি জীবনটা থাকা যাবে পিতৃগৃহেই—যাদা বিশ্বাসের স্নেহচ্ছায়ায়। কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব টের পাওয়ামাত্রই সে ঘোষালবাড়িতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং তৃতীয় কোনো স্বাধীন আশ্রয় নয়, কুমুদিনীর বিকল্প স্বতন্ত্রালয়ের পরিবর্তে শিবালয়।

১৯২৯-এই রচিত ভর্জিনিয়া উল্‌ফের 'এ রুম অব ওয়ানস্ ওন' এ আছে — যদি শেকসপিয়রের এক অনুরূপ প্রতিভাময়ী বোন থাকত, যে ঘরে বসে বসে ভার্জিল আর হোরেস পড়ত কিন্তু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত না — তার পরিণতি কি হতে পারত? পরিবার পরিজন আশা করত সে ছানা, মোজা কাচবে কিংবা স্যুপ ফুটছে কীনা খেয়াল রাখবে। সে পালায়। লন্ডনের রাস্তায় হাঁটতে থাকে। পানশালার ঘরিভোজ বা রাস্তার রাতকাটানো কোনোটাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক অপেরা ম্যানেজার শুধু তরুণী বলেই তাকে দয়া করলেন। ফলশ্রুতি গর্ভবতী হওয়া। এক শীতের রাতে এই প্রতিভাময়ী তরুণী অবশেষে নিজেকে হত্যা করে রাস্তার কবরে শুইয়ে রাখে। গল্পটা কাল্পনিক কিন্তু পরিণামটা খুব সুনিশ্চিত। একমাত্র এইরকমই হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কুমুদিনী আত্মহননের পথ বেছে নেয়নি।

মি সেকেন্ড সেক্স (১৯৪৯) গ্রন্থে সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছিলেন 'মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ মেয়ে হয়ে ওঠে'। এখন আমাদের বিবেচ্য কুমুদিনী কেমন মেয়ে হয়ে উঠেছিল? তার অপরূপ শরীর যেন 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড'। অপরিণীম স্নেহে দাদা বিশ্বাস তাকে শিখিয়েছে ঘোড়ায়চড়া, পিস্তল চালানো, কটাে তোলা আবার অন্যদিকে এস্রাজ বাজানো আর সংস্কৃত কাব্যপাঠ। 'কুমার সম্ভব' পড়া মন নিয়ে ভাবী পতির আইডিয়াল গড়ে তুলেছিল সে। মধুসূদনের প্রকৃতির এবং রুচির স্থূলতা সেই আইডিয়ালকে ভেঙে চুরমার করে দিল।

মুহূর্তেকে পাঁজর গুলো
উঠলো কেঁপে আর্তরবে —
তাই নিয়ে কি সবার সমে
ঝগড়া করে মরতে হবে?

আমরা বুঝতেই পারি 'ঝগড়া করে মরা' কুমুদিনীর স্বভাব বিরুদ্ধ। এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ আর 'সমস্যা' কাব্যগ্রন্থ লিখছেন। 'সবলা'ও লিখছেন, আবার কুমুদিনীকে ঘোষালবাড়িতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্ন তো উঠেছিল এই জন্যই।

রবীন্দ্রনাথ যদি কুমুদিনীকে গৃহত্যাগী করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করতেন তাহলে কি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হতো? এর একবছর পরে ১৯০০ সালে লেখা 'শেষের কবিতা'-র লয়লাই তো শিখিকা। আসলে কুমুদিনী চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সঙ্গে তা খাপ খেত না। এরকম হলেই বরং উপন্যাসটির উপসংহার আরও অতর্কিত এবং অসংগত হতো।

আসলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই বিদ্রোহ হবে, না হলে নয়, কুমুদিনী এই ধারণায় প্রতিবাদ। সে কোনোদিনই মধুসূদনের স্থূল লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বরং আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের অবস্থানভূমির সঠিক চেহারাটা বুঝে নিয়েছে। আর কি তার কোনো ভয় থাকতে পারে? আমাদের কল্পনা করতে ভালো লাগে ঘোষালবাড়িতে কুমুদিনী এক উত্তরনারীকে জন্ম দেবে, যে মায়ের মতোই পরিশীলিত রাষ্ট্রবিষয়ক রুচি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

সুতরাং আমাদের মনে হয় যদি যোগাযোগ-এর উপসংহারটা অন্য কোনো রকম হতো, অর্থাৎ কুমুদিনী গৃহত্যাগ করত বা আত্মহনন করত, তাহলে একটি মহৎ শিল্পই নিহত হতো। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ সেই খাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি।

শিশু-মনস্তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ

আশরাফ হোসেন

ইংরেজি Psychology শব্দ থেকে বাংলায় মনস্তত্ত্ব শব্দটি এসেছে। psyche শব্দের অর্থ আত্মা এবং logy শব্দের অর্থ বিজ্ঞান। psychology শব্দের আক্ষরিক অর্থ আত্মার বিজ্ঞান। যা পুরোপুরি দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। অর্থের ক্রম পরিবর্তনের ধারায় psychology শব্দের বর্তমান অর্থ মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্বের বিষয় হল মানুষের মন, প্রকৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। ঠিক একইভাবে শিশু-মনস্তত্ত্ব হল শিশুদের মন, প্রকৃতি, বিচিত্র ধরণের আবেগ ও অনুভূতি, আচার-আচরণ ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

শিশু কল্পনা-বিলাসী। বিচিত্র ধরণের আবেগ অনুভূতি, কৌতূহল মুক্তির উল্লাসে সে আত্মহারা। কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাতে সে খুব একটা বিচলিত হয় না। শিশু মনস্তত্ত্ববিদদের মতে কল্পনাপ্রবণ শিশুর উপর সমাজের প্রভাব পড়তে থাকে তিন বছর বয়স থেকেই। নানাধরণের জীবজন্তু, মানুষ ও মানুষের আচার-আচরণের প্রতি শিশুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে থাকে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিশু অন্যদের অনেক আচার-আচরণ আয়ত্ত করে ফেলে। শিশুর এই আত্মীকরণের মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমানুকরণ (imitation) সমানুভাবন (suggestion) ও সমানুভূতি (sympathy)। অপরের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতিকে শিশু অভেদীকরণ (identification) প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিজের বলে অনুভব করে।

রবীন্দ্র-কাব্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'শিশু' (১৩১০) এবং 'শিশু ভোলানাথ' (১৩২৯) কাব্যে শিশু মনের বিচিত্র আবেগ অনুভূতি ও কল্পনাকে কবি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। কল্পনাপ্রবণ শিশুর কল্পলোকের পরিধি কতদূর বিস্তৃত তা 'খোকার রাজা' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন। খোকার কল্পনার জগৎ ভূগোলের গণ্ডীতে ইতিহাসের কালসীমায় সীমিত নয়। সে রাজ্যের অধিবাসী মানুষ, গাছপালা, নদ-নদী, আকাশ-মেঘ, নক্ষত্র-রবি-শশী, রাজকন্যা, রাক্ষস "যা খুশি তাই করে/ সত্যেরে কিছু না করে/ সংশয়েরে নিয়ে যায় কাঁকি"।

'সমবাথী' কবিতায় সমানুভাবনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। শিশুর খেলার সঙ্গী কুকুর ছানা এবং খাঁচার টিয়ে পাখী। এদের প্রতি শিশু তার মায়ের মনোভাব লক্ষ্য করে। কুকুর ছানা ভাতে মুখ দিতে এলে মা দূর দূর করেন, খাঁচার টিয়েকে বলেন হতভাগা পাখি। এতে কুকুর ছানা বা পাখি দুঃখ অনুভব করে। শিশুও এদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, দুঃখিত হয় বা মায়ের প্রতি অভিমান করে।

আস্তে আস্তে শিশু বড় হতে থাকে। সমাজ তাকে প্রভাবিত করে। 'বিচিত্র সাধ' কবিতায় তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে—

ইচ্ছে করে সেলেট পেন্সিল দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে যেরি।

ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল বাগানের মালী।

ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি।

ঠিক একই ভাবনায় ভাবিত হয়ে শিশু 'কানাই মাস্টারের' অভিনয় করছে, চাইছে খেয়া ঘাটের মাঝি হতে।

শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে তার মনে জাগে অহংবোধ। বীরত্বের ভাব তার মনকে আপ্লুত করে। 'বীরপুরুষ' কবিতায় শিশুর অহংবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। খোকা তার মাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে অনেক দূরে। ডাকাতরা আক্রমণ করে। খোকা যুদ্ধ করে মাকে উদ্ধার করছে। রূপকথার রাজপুত্র রাক্ষসদের কবল থেকে রাজকন্যাকে যেমন উদ্ধার করেছে। রাজ পুত্রের বীরত্বে খোকা মুগ্ধ। খোকা কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে মনে মনে বীরত্ব অনুভব করে "পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে/ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।" শিশু তার ভাবনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবে। 'বাবার' ইমেজ শিশুর অহংবোধকে নানাভাবে জাগ্রত করে। 'শিশু' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তার প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩২৯-এ। ইতিমধ্যে ফ্রয়েড মনঃ সমীক্ষণ ও স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যার আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় জানা যায় চেতন, প্রাক্ চেতন ও অবচেতন মন নিয়ে মনের পরিকাঠামোটি গঠিত। আমাদের অবদমিত কামনা-বাসনা গুলি অবচেতন মনে বাস করে। সরাসরি চেতন মনে উঠে আসার কোন সুযোগ নেই তাদের। ঐ অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে চেতন মনে উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের মনঃ সমীক্ষণ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিশুদের মন আমি ভালো করেই জানতাম। ওদের সজ্ঞান মন নির্জ্ঞান মন অপেক্ষা বেশি সক্রিয়। রবীন্দ্র-কবিতায় সজ্ঞান-নির্জ্ঞান মন, ঘুমের তত্ত্ব, স্বপ্ন নানাভাবে প্রকাশিত। 'দুই আমি' কবিতায় সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে—

এক জনারেই তোমরা চেন / আর এক আমি করেই না। / কেমনতরো ভাবখানা তার / মনে আনতে পারোই না।

'পথহারা' কবিতায় শিশু তার স্বপ্নের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করছে "যত তুমি ভাবতে পারো,তার চেয়ে সে অনেক আরো।" শিশুর এ স্বপ্ন তার কল্পনা-প্রবণ অবচেতন মনের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শিশু-মনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শিশু-মন সম্পর্কে কবির চিন্তা ভাবনা, অভিজ্ঞতা শিশু-মনস্তত্ত্ববিদদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক নয় বরং সাম্যীকৃত।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের চোখে আইনের দুনিয়া

ছন্দা রায়

রসের কারবারে আমার বিষয়টা হয়তো বে-আইনী ঠেকবে। কিন্তু ছাড়পত্র মিলবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রসঙ্গেই। উত্তীর্ণ-তিরিশ রবীন্দ্রনাথ গল্পকারের কলম হাতে নিতেই আচার্য সুনাথ সরকার নির্দিধায় বলেছিলেন — "those are a truer representation of life, or rather a fuller view of life as a whole than his poems". [সুজন পত্রিকা, ১৩০১]। পূর্বতর জীবনচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ সমকালের সমাজদৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করেছিলেন। আইনের দুনিয়া থেকেও তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। গল্পের আসরে তিনি নেমেছেন উনিশ শতকের শেষ দশকে। আমাদের আইন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তখন মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়ে গেছে।

তাঁর অন্যান্য কথাসাহিত্যিক বঙ্কিম আইনের ছাত্র ছিলেন, কর্মসূত্রেও আইনের জগতের অভিজ্ঞ। প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে প্রশ্নায়িত হয়েছে তাঁর 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'তে। রবীন্দ্রনাথ আইনের বাইরের জগতের মানুষ। কিন্তু তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র কিছু গল্প-প্রসঙ্গ সন্নিবেশে নিলে আইনের দুনিয়াটা আপনি উঠে আসে।

আমাদের আইনব্যবস্থার আধুনিক বিধাতা ইংরেজ। সভ্যতার দর্পে, সমদর্শিতার ছলনায় উপনিবেশের মানুষের জন্য তাঁরা আইনের কাঠামো গড়েছিলেন। আইন প্রয়োগও প্রয়োগ করেছিলেন নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে। তাঁদের আইন-ব্যবস্থার অসংগতি রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে যায়নি। ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ পদগুলি বরাবর ছিল শ্বেতাঙ্গদের দখলে। অর্ধশতের পর প্রশস্ত থাকার নিয়তির পথেই চরিতার্থ ছিলেন অধিকাংশে দেশীয় মানুষ। দেওয়ান-মুন্সীদের পর এসেছিল উকিল-মোক্তারদের পসারের কাল।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রধান-অপ্রধান চরিত্র মিলিয়ে আইনজীবীর সংখ্যা কম নয়। 'দান-প্রতিদান' গল্পের উকিলবুদ্ধি রামমুকুন্দ মোক্তারিতেই পসার জমিয়েছে। 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক অমৃতলাল শিওরকে দেখেছে আদালতের কর্মচারীদের উমেদারী করতে। জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হওয়াই তার উচ্চাশার চরম সীমা। কিন্তু হঠাৎ জেগেছে তার দেশপ্রেমের নেশা। সেই কাজে তার তালবাসার সুরমা হয়েছে উকিল রামলোচনের মেয়ে।

সেকালে কিছু নব্যযুবকের ঝোঁক ছিল ব্যারিস্টারিতে। কিন্তু আমাদের সমাজ সাগরপারের মানুষদের মানলেও সাগর পাড়ি দেওয়াটা সহজে মানেনি। 'ত্যাগ' গল্পের সমস্যার জন্ম সেখানেই। ব্যারিস্টারি পড়তে জাহাজের বিলেত গমনের দায়ে জাতিচ্যুত হলেন প্যারীশঙ্কর। প্রতিশোধ নিলেন তিনি বিরুদ্ধ দলপতির জাত মেরে।

সাধারণ মানুষের কাছে আইন-আদালত বরাবরই ভয়ের কারণ। মুন্সেফ আর জজসাহেবের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছে 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পের নিরীহ গৃহিণী। আদালত যে অর্থশোষণের ফাঁদ, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'ব্যবধান' গল্পে। একটি ছোট নালার দখল নিয়ে দুই পরিবারে যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছে, "তাহার প্রাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।"

ইংরেজ-প্রবর্তিত আইন শুরুতে আস্থা জাগালেও ক্রমশ তার অসম নীতি এদেশে মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল। 'মেঘ ও রৌদ্রে'র নিতান্ত বইনুখো লাজুক শশিভূষণ ক্ষমতাবান শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার এবং তাদের প্রতি আইনের পক্ষপাত দেখতে দেখতে প্রতিবাদী চরিত্রে রূপান্তরিত। আইনপাশ অন্ধ জীবিকাবিমুখ মানুষটির কাছে তখন আইনই লড়াইয়ের হাতিয়ার। তার ব্যর্থতা এসেছে বলবন্ত সমর্থনের অভাবে।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, আইনের দুনিয়া মানেই মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা হেসেখেলে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' প্রমাণ হয় সত্যভাষণের দায়ে। রামকানাই সত্য বলেছে অন্তরের তাগিদে। কৃতিত্ব দাবি করেছে বিপক্ষের উকিল — "যাই জোড়া লোকটাকে কেমন চেপে ধরেছিলুম।" আশুপ্রসাদের এই ছলনাটুকু গল্পকারের বাঙ্গের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে আইন-আদালত প্রসঙ্গ শুধু তথ্যরূপে আসেনি। তা কাহিনীর ভিত্তিতে এসে জীবনের রূঢ় সত্যকে অনাবৃত করেছে, নাড়া দিয়েছে সমাজ-চৈতন্যের মূলে। 'গল্পগুচ্ছে'র দুটি অনবদ্য আইনী গল্প 'বিচারক' আর 'শাস্তি'। আইনের জগতের ভাষাতেই গল্পদুটির শিরোনাম। দুটিতেই ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত দুই নারী। তাদের সামাজিক পরিচয় ও পরিণাম ভিন্ন। কিন্তু অপরাধ নির্ণয়ের চৌলদণ্ডকে দুজনেই ভেঙে চুরমার করেছে।

'বিচারক' গল্পে জজ মোহিতমোহন রাষ্ট্র ক্ষীরোদার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সামাজিক পক্ষোদ্ধারের হিতবোধে। অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, এই বিধবা নারীর প্রেম-মুগ্ধতার সুযোগে তাকে নবীন যৌবনে ফুলশয্যা করেছিলেন তিনি নিজে। তারাশঙ্করের মতো রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিচারকের আত্মসমীক্ষা দেখাননি। ক্ষমতামদোদ্ধত জীবনে প্রেমকে সযত্নে লালন করার গৌরবে মহীয়সী করেছেন ক্ষীরোদাকে। মোহিতচন্দ্রের বিচারের ভার পাঠকের উপর।

'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদার বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর নেই। কিন্তু 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা বিদ্রোহিনী। স্বামীর দেওয়া অকৃত অপরাধের দায় প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করে এবং যেচ্ছায় নিজেকে ফাঁসীর দড়ে নিশ্চিন্ত ক'রে নিজের নীরব অভিমান আর প্রতিবাদ প্রকাশ করেছে চন্দরা। তার প্রতি বিচারকের দণ্ডদেশে সত্যানুসন্ধানের ব্যর্থতাই প্রমাণিত।

'শাস্তি' গল্প চন্দরবার ট্রাজেডি নয়, তবে আত্মমর্যাদার বিজয়ঘোষণা। ট্রাজেডি এসেছে তার স্বামী ছিদামের জীবনে। আইনগত সাক্ষ্য-প্রমাণে সে চিরকালের জন্য হারাতে বসেছে চন্দরাকে। অসহায় শূন্যতা আর অপরাধের বোঝা নিয়ে আদালত-কক্ষের বাতায়নে বসে আছে ছিদাম। প্রাঙ্গণের বটগাছে তখন কোকিল ডাকছে। কোকিলটি সুখী, কারণ "তাহাদের কোনরূপ আইন-আদালত নাই"। এ অনুভব আইনের হাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের।

ঈশানকোণে রবীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

প্রারম্ভ : রবীন্দ্রভুবন সর্ব পরিব্যাপ্ত, দেশ-কাল-সীমার ঊর্ধ্বে। একথা জেনেও একটা পরিমিত সীমানায় রবীন্দ্রনাথকে রাখতে চাইছি কারণ সমুজ্জ্বল রবিরশ্মি ঘুরে গিয়েছিল বাংলার ঈশান কোণের তিনটি জায়গা — শিলঙ, গুয়াহাটি ও সিলেট। ঈশানকোণের শ্যামল প্রকৃতি যেমন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল তেমনি এই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে ঈশানকোণকে গৌরবান্বিত করেছেন। ঈশান কোণের কোন্ কোন্ ঐশ্বর্য রবীন্দ্রমানসকে উজ্জীবিত করেছিল সেটাই আমার আলোচনার বিষয়।

ঈশানকোণের ভৌগলিক পরিচিতি : মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙ সবুজ পাইন বনে ঘেরা একটি শৈল শহর।

ব্রহ্মপুত্রের বামতীরে কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত গুয়াহাটি অসমের রাজধানী।

সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত সিলেট শহর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত সিলেট জেলার সদর।

ঈশানকোণে রবিরশ্মি। বর্ণিত এই ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন তিনবার — ১৯১৯, ১৯২৩ ও ১৯২৭ খ্রীঃ।

প্রথমবার প্রথমে আসেন শিলঙ (১১ই অক্টোবর) এরপর গুয়াহাটি (৩১শে অক্টোবর) হয়ে সিলেট (৬ই নভেম্বর)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গরমের ছুটি কাটাতে শিলঙ এসে প্রতিবারই প্রায় ঘুমাস করে সেখানে ছিলেন।

ঈশানকোণে সাহিত্য সৃষ্টি : তিনবারের আসা-যাওয়ার রবীন্দ্রজীবনের প্রায় পাঁচমাস সময় কেটেছে ঈশানকোণে। প্রথমবার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য এখানে সৃষ্টি হয়নি।

দ্বিতীয়বার শিলঙে বসে লেখেন 'শিলঙের চিঠি' কবিতা এবং 'রক্তকরবী' (রক্তকরবী) নাটক।

তৃতীয়বারের রচনার তালিকায় আছে 'তিনপুরুষ' (যোগাযোগ) উপন্যাস এবং 'নতুন', 'শুকসারী', 'সুপ্রভা' ও 'দেবদারু' — এই চারটি কবিতা।

ঈশানকোণের ঐশ্বর্য : রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার। (ক) নিসর্গ প্রকৃতি — 'ভানুসিংহের পত্রাবলীর' ৩৯ নং পত্রে, 'শিলঙের চিঠি' কবিতায় শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। শিলঙের এই শোভাকে কবি অমরত্ব দান করেছেন তাঁর একটি আশ্চর্য সৃষ্টি 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে।

(খ) লোকসাহিত্য — সিলেট, সুনামগঞ্জের এক পল্লীকবি হাছন রজার কিছু কিছু গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলব্ধির আনুরূপ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০০-এ হিবার্ট বক্তৃতায় তিনি তা উল্লেখ করেছিলেন।

(গ) বনের শিল্প — অসমীয়া মেয়েদের বয়নশিল্পে সহজাত নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অনুরূপ তাঁতশিল্প শেখানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

(ঘ) মণিপুরী নৃত্য — ১৯৪১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে শ্রীহট্ট, বাণীচক্র ভবন থেকে প্রকাশিত 'কবিপ্রণাম' গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় সিলেটে মণিপুরী নৃত্য দেখে শান্তিনিকেতনে এই নৃত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। সেখান থেকেই কবি শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কেউ এত দূরে যেতে রাজী না হওয়ায় ত্রিপুরা থেকে নৃত্য শিক্ষক আনা হয়।

উপসংহার। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। নিখিল পৃথিবী এবং বিশ্বমানবের কাছ থেকে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। এই প্রেরণার মূলে বাংলার ঈশানকোণের মাটি ও মানুষ, নিসর্গ প্রকৃতি ও মানব সংস্কৃতি কবিকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তা নগণ্য নয়।

গ্রন্থসূত্র :—

১। রবীন্দ্ররচনাবলী : একাদশ খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

২। রবীন্দ্ররচনাবলী : চতুর্দশ খণ্ড : বিশ্বভারতী সংস্করণ।

৩। রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, (২য় সং)।

৪। কবিপ্রণাম : বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট : ডিসেম্বর, ১৯৪১।

৫। স্মরণিকা : নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দ্বিষষ্টিতম অধিবেশন, ১৩৯৬, শিলচর।

রবীন্দ্র উপন্যাস : একটি প্রশ্ন

অরুণ বসু

কবি শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ মহাশয় একবার বলেছিলেন যা সময়কে স্পর্শ করে যায়, তা আধুনিক নয়, আধুনিক হল যা সময়কে অতিক্রম করে। অর্থাৎ যে সাহিত্য সময়ের গভীর থেকে জন্ম নেয় — তাই হল আধুনিক। সুতরাং, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সময় ও কাল আধুনিক সাহিত্য বিচারের এক প্রবল মাননত।

আধুনিক সাহিত্য আধুনিক শিক্ষার ফসল। পলাশির যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে সারা ভারতে তাদের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দেবার পর ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি এমন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী করতে হবে,যা হবে শাসক ও শোষিতের মধ্যবর্তী স্তর। এবং অবশ্যই এই নতুন শ্রেণীর শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। ১৮৩৬ সালে আসামে অসমিয়া এবং উড়িষ্যাতে উড়িয়া ভাষা পড়ান নিষিদ্ধ হল। এটা হল এমন এক ধরনের Politics যা অন্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করে। ব্রিটিশরাও তাই করলেন।

ফলে ঔপনিবেশের সময়ে যে মানস পরিবেশ গড়ে উঠল তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধ্যান ধারনায় পুষ্ট একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বলা যায় তখনকার শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও সেই সমাজ মানসের প্রতীক তিনি। কিন্তু সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করার প্রশ্নে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান কোথায় সেটা জানা প্রয়োজন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে একদল ভূমির উপর নির্ভরশীল এক নতুন জমিদার সম্প্রদায় যেমন গড়ে উঠল, তেমনি এই একই সময়ে মধ্যবর্তীনিকারী ও নানান বৃত্তিজীবী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীও আত্মপ্রকাশ করল। অর্থাৎ একই সময়ে এক জমিদার সমাজ ও তাদের কেরানী সমাজ জন্মলাভ করল। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে এই নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ এগোল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। কিন্তু এর বাইরে আচণ্ডাল যে বিরাট ভারতবর্ষ পড়ে রইল, নতুন শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হয়ে গেল মেরু প্রমাণ এবং ব্রিটিশ শোষণের আখ মাড়াই-এ তাদের সমস্ত রস নিষ্কাশন করে নিতে যে ইংরেজরা, কিছু বিস্কুটকোটা দিয়ে গেল নতুন জমিদারী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা যাক।

উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেশে দুর্ভিক্ষ হল সাতবার, প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ মরল, দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষ হল চব্বিশ বার। মৃতের সংখ্যা কুড়ি লক্ষের উপর। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে চাল-গম রপ্তানীর ছবিটা উল্লেখযোগ্য — ১৮৪৯ খ্রী: ৮৫৮,০০০ পাউণ্ড, ১৮৭৭ সনে ৭৯০০,০০০ পাউণ্ড, আর ১৯০১ সনে ৯০০০,০০০ পাউণ্ড। দেশের "সমৃদ্ধি"র জন্য ভরাকের ভাবে সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পেল। ১৮৪৮ সনে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৭৩ সনে ১৪০০ লক্ষ পাউণ্ড, আর ১৯০০ সনে তা গিয়ে দাঁড়াল ২২৪০ লক্ষ পাউণ্ডে। এই চাল গম আর টাকার হিসাব ধান ভাঙতে শিবের গীত নয়, শঙ্খবাবু যে সময়ের কথা বলেন, সেই সময়ের ফেলনতের প্রতি আস্থা পড়ে ওঠে এই হিসাবের পর্বে পর্বে।

ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম গুলির উপর যে অসহনীয় দারিদ্র্য দিন দিন চেপে বসছিল, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। ছিন্নপত্রাবলী যুগ থেকে যে সম্পর্ক হয়েছে গভীর। জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পাবার পর তিনি যে সব নিয়ম পরিবর্তন করলেন, তা রীতিমত দুঃসাহসিক। ১৯১৬ সালের রাজসাহীর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ও, মালী সাহেব জমিদার রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তবে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থা বা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন ছিল তাঁর সাধ্যের অতীত, এটাও মেনে নিতে হয়।

যদিও এটা অত্যন্ত খণ্ডচিত্র এবং বহু তথ্য রয়ে গেল না বলা, তথাপি অস্পষ্ট যে পটভূমিকাটা আঁকা হল — তার ভিত্তিতে এই কথা বলা যায় যে রবীন্দ্র জীবন গঠনে এই কথাগুলো ছিল অত্যন্ত জরুরী। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানে বা অন্য গানে এবং কবিতায় যে বিষণ্ণতা ঘুরে ঘুরে আসে, সেই বিরহের উৎসটির একটি তার অবশ্যই দেশের ত্রাসকরুণ অবস্থা এবং নিজের সীমাবদ্ধতা। ছোটগল্পে, নাটকে প্রবন্ধে সর্বত্রই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই ভয়াবহ অবস্থা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেল। শুধু, উপন্যাসে কবি আশ্চর্য রকমে উদাসীন রইলেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে — একমাত্র 'গোরা' বাদে — দেশের এই ছবি কি আমরা পেলাম? যদিও গোরা শেষ পর্যন্ত তত্ত্বালোকে পর্যবসিত, তথাপি মুসলমান তরিতদের মুখে কোনো ভাষা বিদ্যুৎ চমকের মতন দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বললেন ত্রাত্য, মন্ত্রহীন, কিন্তু দেশের ত্রাত্যজনের সংগীত রবীন্দ্র উপন্যাসে কোথায়?

আমি কিন্তু ধান ক্ষেতে কোথাও খুঁজছিনা — শুধু আলের ধারে বসে ভাবছি, জমি ছিল, শস্যবীজ ছিল, আকাশে মেঘ ছিল সবই ছিল, কিন্তু ফসলটা ফলল না। আর এই ফসলের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতে হল — আরো কয়েক বৎসর।

রবীন্দ্রসাহিত্যে গৃহপালিত পশুপক্ষী

রণজিৎ বিশ্বাস

সুদূর অতীত থেকে পশুপক্ষী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ব্যবহারিক ও মানসিক প্রয়োজনে কোন কোন পশুপক্ষী আজ মানবজীবনের প্রতিবেশ্য অঙ্গ। দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাস করে মানুষের কোন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে — বিশেষ করে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে। ভালোলাগা মন্দলাগার মানুষের মতোই তাদের প্রতিক্রিয়া। অনুভূতিশীল মানুষের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। তাই — বিশ্বকলায় তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

আদিকবির সৃষ্টির উৎসে খুলে দিয়েছিল শরবিদ্ধ পক্ষিরি শোক। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন না হলেও পশুপক্ষীর জন্য একটা বড় জায়গা রয়েছে তাঁর সাহিত্যে। পশুপক্ষী চিত্রণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র উত্তরকালে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তারা সাহিত্যে এসেছে নিছক ব্যবহারিক প্রয়োজনে। তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয় নি মানুষ। ব্যতিক্রমও আছে। কালীদাসী মহাভারতের বিরাট ও দ্রোণ পর্বে যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী ও অশ্বের প্রতি দরদী মনের প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ব ও উত্তর স্রোতে দূতবতী পাতীদের জোরালো ভাবে উপস্থিতি। সকল কাব্যগ্রন্থেই প্রায়ই পশুদের রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পশুকে পশু হিসাবে ও মানুষের সুখ দুঃখের অংশী করে উপস্থিত করতে বঙ্কিম যুগ কেটে গেছে।

যুগ-যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্রন্দিষ্ণু মনের সন্ধান পেতে হলে রেনেসাঁর ভল পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। রবীন্দ্র পূর্ব যুগ গুরুপ্রসন্ন ও রামা কৈবর্তদের বাইরের দুঃখটাই দেখেছিল। রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র উত্তর যুগ দরদীর গভীরে প্রবেশ করে। তাই রচিত হতে পারে 'মহেশ' 'আপদ' 'কুকুর ছানা' 'কলাপাহাড়' 'শাদাঘোড়া' 'একজলি জমি' 'আহ্বান' 'গল্পের জননীর' মতো রচনা — সেখানে মানুষ সব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত পশুপক্ষীকে ভালোবেসে মানসিক মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায়। এর শুভসূচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ছবি, গান প্রভৃতিতে পশুপক্ষীর সীমিত অথচ স্থিরকক্ষের মতো দীপ্তিময় উপস্থিতি। বিসর্জনে সংঘাত-ক্ষত হয় অপর্ণার পালিত ছাগশিশুর বলি দেওয়াকে কেন্দ্র করে। রক্তবাস্তবের অভিঘাতে জীবন যখন ওষ্ঠাগত হতে চায় তখন মানুষ বাঁচতে চায় অনেক সময় তার পালিত পশুকে ভালোবেসে। জীবজন্তু হয়তো অন্যের মধ্যেই প্রতিদান নিতে কখনো ভুল করে না। (অপর্ণা বলে "মা হারা শাবক _ অম্বিকা তার মাতা। " বোবা মেয়ে সুতা নিজেকে পিতামাতার নিকটে কতটা প্রকাশ করতে পারে তার থেকে বেশি পারে তাদের গরু সবলী ও পাখিদের কাছে। জরুরকালীর আজন্মলালিত সংস্কার ঘুরে মুরে যায় মৃত্যুভয়ে ভীত ওরেংয়ের করুণ চোখের দিকে চেয়ে। জরুরকালীর সত্যদ্রষ্টার অনুভবকে রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়েছেন এই ভাবে, "এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন।" রসরচনাধর্মী ঘোড়া গল্পে দেখা যায় ঘোড়ার 'পালাতে পালাতে একেবারে না মরে যাওয়া'র তীব্র ইচ্ছাকে লাগাম দিয়েছে মানুষ। কালোঘোড়া কবিতার ঘোড়া অবশ্য অন্য ব্যাপার। (কালোঘোড়া সারারাত্রির অন্তরে যে ঘোড়া নিশ্বাস।)

চৈতালির কয়েকটি কবিতায় মানুষ ও পশু-একে অপরের আত্মীয় হয়ে উঠেছে। পরিচয় কবিতায় ছাগশিশু মানব শিশুর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে চায়। কর্মভবে অবশ্যই অতি ছোট নিধি এ ব্যাপারে সহায্য করে। — "এক কক্ষে তাই লয়ে অন্য অকল্যাণ/দুজনের আছি নিল সমান সোহাগ।" 'পুঁটু' কবিতার আপাতদৃষ্টিতে কৌতুকময় ঘটনার মধ্যে মানুষের পশুপ্রীতির এক সুন্দর উদাহরণ। স্নান করানোর জন্য যুবক গোরুকে নাম ডাক ডাকছে। কবি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝলেন, 'হেরি সে যুবারে প্রেমে পুঁটুরানী ভরি।/মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধারসি।'

কোথাও বা গৃহপালিত পশুর সামান্য উল্লেখে কবিতা বাস্তব জীবনের চলমান ছবিতে পরিণত হয়। 'ধবলিরে আন গোহালে,' — এই একটি মাত্র পঙক্তি কবিতাকে জীবন্ত করে তোলে। পরিণত বয়সের 'ছুটির আয়োজন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ধরণী মনের চরম প্রকাশ ঘটেছে। শারীরিক অসুস্থতায় যে মনে রয়েছে ছাগলছানাদের কথা। কবির সময় হয় তাদের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলার :—

আর দেখছি সামনে ঘিরে
চেটশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের ধারন দেওয়া বড়ি ঘেঁষা ছাগল ছানা
পাঁচটা ছ'টা করে,
তাদের নিষ্ফল কান্নার ঘর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের বনের দোলা শরতের শূন্য অঙ্গনে।
কেমন করে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

অন্যান্যদের মতো রবীন্দ্রসাহিত্যেও পশুদের তুলনায় পাখিদের কথা কম। 'ছোটো কাহিনী', 'দুই পাখি'র মতো কিছু কিছু রচনা থাকলেও সেগুলি প্রায় রূপকার্থে। মানুষের বাস মাটিতে, পাখিদের আকাশে। মৃত্তিকের জন্যই যেন উভয়ের জন্যে আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠল না। পাখি কেবলই উড়ে যেতে চায়। তাই বুঝি তার জন্য খাঁচা। কখনো বা সোনার খাঁচা।

রবীন্দ্রকবিতায় প্রকৃতি

মিনতি দেবনাথ

মানুষের জীবনে ভয়ংকরের বিস্ময় আসে তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময় হচ্ছে প্রকৃতি। এই বিস্ময় ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। আনন্দময়ের চোখে এ বিস্ময় কেবল মুগ্ধতায় পর্যবসিত হয়। বিজ্ঞানীর মনে জাগে নতুনতর প্রশ্ন আর তার সমাধানের সূত্রে আসে নব নব আবিষ্কার। আর সেই একই বিস্ময় থেকে কবির কলমে ফুটে ওঠে কবিতার শতদল।

প্রকৃতি তার অপরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে বিরাজ করলেও সকলের মনে তা সমানভাবে সাড়া জাগাতে পারে না। কেউ প্রকৃতিকে দেখেন অবসরমত জানা কাজের ফাঁকে। আবার কেউবা অবে মাঝেই ডুব দিতে চান প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য সমুদ্রে। ব্যক্তি গত জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে উপভোগ করতে চেয়েছেন প্রকৃতির সান্নিধ্য। প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের যে সৌন্দর্যসুধা কবি পান করেছেন, যে আনন্দ অনুভব করেছেন আপন হৃদয়ে, তার রসরূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায় অজস্রধারায়।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের এক আত্মীয় বন্ধনের কথা অনুভব করেছেন কবি বারবার, আর তাঁর সেই অনুভব উচ্চারিত হয়েছে বহু কবিতায় বারবার। এমনি একটি কবিতা 'সোনারতরী'র 'বসুন্ধরা'। কবিতাটিতে পৃথিবীর সঙ্গে কবির সর্বাঙ্গীন সংযোগ ছন্দে ছন্দে বিধৃত হয়েছে গভীর মমতায়। সে সংযোগ শুধু এখনের নয়, জন্মজন্মান্তরের।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অনন্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
শতকোটি তপন, অসংখ্য রজনীদিন
মৃদুপক্ষপুট ধরি আমার মাথায়ে
বুলায়েছ স্নেহ তব, পুষ্প তারে তারে
মুদিয়াছে, বর্ণ করেছে তরবারি
পত্রপুট তল পড়েছে।

প্রকৃতিকে যে কবি সর্বদা একই রকম দৃষ্টিতে দেখেছেন এমন নয়, কখনও প্রকৃতিকে দেখেছেন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিতে আবার কখনও বা বস্তুগত উপভোগের নিরিখে। ফুল প্রয়োজনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য দৃষ্টির অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে 'বীথিকা'র 'নিমন্ত্রণ' কবিতায়। কবি সেবনে প্রেয়সীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন—

"বেতের ডালায় রেশমী রুমাল-ঢাকা
আছে বকুল আর এনো খোঁপাসাজ।"

ফুলের রাজা 'আম' তার হিসেবে উপাদেয়। এইখানে তার উপভোগিতা। সেই 'আম' আর তখন 'রেশমী-রুমাল-ঢাকা' 'বেতের ডালায়' মূর্তিত হয় তখন তা হয় দৃষ্টিনন্দন, আর প্রেয়সীর খোঁপায় হয়তো সেবনমাধুর্যের চেয়ায় সেই একই আম হয়ে ওঠে হৃদয়ের বস্তু।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত প্রকৃতি কেবলই স্নিগ্ধ, মধুর, সুন্দর নয়। কখনও আবার তা ভয়াল কঠোর। পঞ্চপুট-এর কয় পঠিত 'পৃথিবী' কবিতায় আমরা একটি অন্য কবিতার আধারে প্রকৃতির এই ভয়াল বিপরীত রূপসমূহের একটি সংহত বর্ণনা পাই। এই পৃথিবীর — "একদিকে আপনধানাতারনন্দ" অন্য দিকে "জলহীন তলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্র"। এই হচ্ছে পৃথিবীর সামগ্রিক রূপ।

কনকচাঁপার কঙ্কাল

কুন্তল রুদ্র

মেয়েটির নাম হতে পারতো কনকচাঁপা। হতে পারতো কেন তাই হয়েছিল। লেখক নামটা নিয়েছেন একটু ঘুরিয়ে, 'কোনো এক ডাক্তারের' মুখ দিয়ে — মনে হয় সে শশীশেখর। গল্পটির নামও 'কনকচাঁপা' হলে ক্ষতি ছিল না। তবু লেখক গল্পের নাম দিলেন 'কঙ্কাল'।

কঙ্কাল, অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতিমূর্তি। শুষ্ক, প্রাণহীন। সে বাঁচতে চেয়েছিল, সকলেই যেমন চায়। বাল্যবিবাহ এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ দাম্পত্য জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা থেকেই তার জীবনের পথ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল — সে পথ সরল স্বাভাবিক নয়। বিকৃতির ভঙ্গীতে বিন্যস্ত তার জীবন। সে যা চায় না তার জীবনে তাই এসে পড়ে, আর যাকে চায় সে সরে যায়, ঘুরে।

পূর্ণযৌবনা সুন্দরী বিধবা সামরিক বাধ্য বাধকতায় হয়ে পড়ে আত্মরতিপরায়ণ। সামাজিক বিধিনিষেধকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, আবার তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চরিত্রিক স্খলনের দিকেও যায়নি। তার পথ বঙ্কিম। এ যদি মানসিক বিকার হয় তবে তা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিগত।

শশীশেখরকে ভালবেসে সে জীবনের স্বাভাবিকতাকেই কামনা করেছিল। আত্মরতিতে তার কামনা চরিতার্থ হয় নি — 'প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মত হু হু করিয়া উঠিত'। ডাক্তারকে কাছে পেয়ে কামনা যেমন তীব্র হয়, তেমনি জমা হতে থাকে অচরিতার্থতাবোধের বারুদ। এই অনুচ্চারিত প্রেমের জ্বালাময়ী পরিণামের জন্য ভিতরে তার প্রস্তুতি চলে। ভালবাসা এবং মৃত্যু তার চোখে একাকার হতে থাকে।

ডাক্তারের বিবাহ সংবাদে ঘটে বিস্ফোরণ, যার প্রচণ্ডতায় ছারখার হয়ে যায় সবকিছু। কনকচাঁপা শুধু নিজেই মরে না, তার আগে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে শশীশেখরকে — তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয় এইভাবে। তার সম্পর্কে তার স্বামীর লক্ষণবিচারকে সে নিজেই সত্য করে তোলে। সে হয়ে ওঠে 'বিষকন্যা' — শশীশেখর এবং নিজের উভয়েরই ক্ষেত্রে। কনকচাঁপার ভিতরের কঙ্কালটি, তার কামনার নগ্ন রূপটি সর্পিনীর মত প্রচণ্ড হিংস্রতায় প্রকাশ পায়। তখন ঘুরে চলে যায় বাঁশির শব্দ, জ্যোৎস্না অন্ধকার হয়ে আসে, তরুপল্লব, আকাশ, আজন্মের পৃথিবী মায়ার মত মিলিয়ে যেতে থাকে। হারিয়ে যায় রঙীন নেশার মত হাসি, বিস্ময়ের বেশ, বাসর।

এতে কি কলঙ্কে — শুধু আত্মরতির কাহিনী, অথবা মন কেশ প্রফুল্ল হয় এমন কোনো মজার গল্প। প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধচালিত পূরুষপ্রধান সমাজে নারীজীবনের এই বিকৃতি ও বিনষ্টি মৃত কামনার এক বিষণ্ণ কঙ্কালকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের সামনে। সৌন্দর্যের এই অপমৃত্যুর সূত্রে আমরা আবিষ্কার করি কনকচাঁপার কঙ্কাল। এই বিকৃতির মধ্যে থেকেই উঠে আসে এক দুঃসহ কঠিন আদিম জীবন সত্য। 'কনকচাঁপার মধ্যে কঙ্কাল' হয়ে ওঠে এই গল্পের মূল চিত্রকল্প (Germinal Image)।

একে অতিপ্রাকৃত গল্প হিসাবে চিহ্নিত করার অর্থ উদ্ভিখিত নিষ্ঠুর আদিম জীবনসত্যকেই আড়াল করা। অতি প্রাকৃত বা Supernatural বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুবিসর্গও এখানে নেই। ওটা গল্প বলার কৌশল। এ বড় বেশি প্রকৃত, খাঁটিম — অতিপ্রাকৃত নয়, অতিশয় প্রাকৃত।

শারীরিক 'মৃত্যুতেই 'কনকচাঁপা নিঃশেষ হতে চায় না। অচরিতার্থতার বেদনা বুকে নিয়ে যেন ফিরে আসে। নিজেকেই খুঁজে ফেরে, খুঁজে ফেরে সেই শুরু র যানা — 'নির্লজ্জ, নিরাবরণ, নিরাভরণ, চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল', যার মধ্যে যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করে ফুটে উঠত। গল্পের শুরুতে কঙ্কাল ছিল না এবং বিশেষত গল্পের শেষে তো নয়ই। তখন আর কনকচাঁপার সেহল সৌন্দর্য নেই, নেই যৌবন। শুধু আছে নিজের হারানো সত্তার প্রতি এক বিষাদময় মমত্ববোধ। সেই মমতাই তাকে টেনে আনে বুধি, তার আদিম রূপের সন্ধানে। রূপের পরিমা, যৌবনের উত্তাপ, নারীর অভিমান, জ্বালা, প্রতিহিংসার পরিবর্তে শুধু এক বিপন্ন শূন্যতাবোধ। আর আছে, মানুষের কাছে বসে, মানুষের মতো করে, মানুষের গল্প করার নিবিড় আকুতি।

নায়িকার জবানীতে উপস্থাপিত হওয়ায় গল্পটিতে তার জীবনাকৃতির তীব্রতা সঞ্চারিত হয়ে যায়, কাহিনী অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। গল্পকার এখানে পাঠকের সঙ্গী, শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। গল্পের শুরুতে তিনি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যান জীবনের সেই আদিম লোকের অন্ধকার পরিমণ্ডলে, যেন আর এক দরাজরাল জগতে। আবার গল্পের শেষে অপরিমীম বিষাদের ঘুমন্ত আবহ থেকে আমাদের নৌছে দেন ভোরের আলোর স্বাভাবিকতায়। মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মানবজীবনরহস্যের এই মৌলিক উন্মোচন আমাদের বিমূঢ় বিহ্বল করে রাখে শুধু। তখন হিন্দু বাঙালী বিধবার মৃতদেহ দাহ হওয়ার পর কঙ্কাল থাকে কিনা — এ প্রশ্ন অর্থহীন। এর দ্বারা গল্পের প্রতীতির ঐক্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ ইতিমধ্যে আমরা কঙ্কালের ভিন্নতর তাৎপর্যকে বুঝে নিই। লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না যে 'কনকচাঁপার মতো কঙ্কাল' এবং 'গল্পের কঙ্কাল' এই দুই প্রয়োগে কঙ্কাল শব্দটি এক ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায় — প্রথমটিতে বিষণ্ণতা, প্রাণহীনতা, সৌন্দর্যহীনতা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনিবার্যতা, ভীষণতোর কথাই মনে জাগে। তা গল্পের প্রতীতির ঐক্যকে সুদৃঢ়ই করে। গল্পের পরিণামী আবেদনে তাই পাঠকের মনে কোনও কঙ্কালের স্মৃতি জাগে না — ভেসে ওঠে একটি মেয়ের মুখ, ব্যর্থকাম, নিঃস্ব, রিক্ত, যন্ত্রণাদগ্ধিত, বিদুল, একক।

লণ্ডনের ডাকে 'ডাকঘর' এবং প্রাসঙ্গিক অনুভবমালা

সুনীল দাশ

রবীন্দ্র নাটকের ক্ষেত্রে তো বটেই, আমাদের জানা নাট্যজগতে এমন একটি ঘটনা আর দ্বিতীয় নেই সম্ভবত। ডাকঘরের প্রিমিয়ার প্রসঙ্গে বলছি। ১৯১১তে লেখা, ১৯১২তে মুদ্রিত 'ডাকঘর' নাটকের প্রথম অভিনয়সন্ধ্যা নাটকঘরের ভেতরে নয়, ভারতবর্ষের বাইরে-বুরোপে। ডাবলিনের অ্যাবি থিয়েটারে, 'ডাকঘরের' প্রথম অভিনয় হ'ল মূল ভাষাতে নয়, ইংরেজি অনুবাদে। ১৯১৩ সালের সেই অভিনয়ে পর্দা ফেলিয়া মঞ্চসজ্জায় অ্যাবি থিয়েটার প্রযোজনায় ডাকঘরের সকলীয়কেই সাদা পোশাক পরানো হয়েছিল। ১৭ মে'র ওই অভিনয় অনুষ্ঠানের মাত্র দিন সেট এডুয়ার্ড কলেজের জন্যে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল। অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তরুণী অভিনেত্রী শিল্পী লিলিয়ান ইয়াংগো। লিলিয়ান অমলের অভিনয় করার আগে সুনাম অর্জন করেছিলেন — গ্রেগরি হাউপ্টমানের রূপক সাংকেতিক নাটক 'হ্যানেলে হিমেলফার্থর্ট' (হ্যানেলের স্বর্গযাত্রা) এ হ্যানেলে নামে ছোট মেয়েটির চরিত্রে। অ্যাবি থিয়েটারের এই প্রযোজনার তিন মাসের মধ্যে ১৯১৩ সালের ১০ জুলাই আবার ইংরেজি অনুবাদে ডাকঘর এর অভিনয় হয়েছিল লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে।

লণ্ডনে 'ডাকঘর' এর সেই মঞ্চায়নে আমি বহু পূর্বে উপলক্ষে গতবছর ৩০ অক্টোবর লণ্ডনের ভারতীয় বিদ্যাভবনে কলকাতার সংবর্ত গ্রুপ থিয়েটার মূল ভাষায় ডাকঘর মঞ্চস্থ করেছেন। দর্শকাসনে লণ্ডনের বাঙালী দর্শকদের পাশাপাশি বাংলা-না-জানা দর্শকেরাও ছিলেন। বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের ডাকঘর-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের অনি বহর দ্বারক নতুন দুটি প্রযোজনার (মূল ভাষায় নয়, ইংরেজিতে) দুই পরিচালিকাও উপস্থিত ছিলেন সংবর্তের ওই অভিনয় সন্ধ্যায়। এঁদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যাভবনের বাংলা ভাষার শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী নন্দিতা আচার্য বয়ং ছিলেন ৩০ অক্টোবর লণ্ডনে বাংলার ডাকঘর মঞ্চস্থ করানোর প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর নিরন্তর পরিশ্রম এবং চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের আনুকূল্যেই অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় পরিচালিকা হলেন শ্রীমতী জিল পারকিন। বৃটিশ নাট্য পরিচালিকা ও লেখিকা শ্রীমতী জিল পারকিন গত বছর উইলিয়ম রাদিচে অনূদিত ডাকঘরের নতুন ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে ডাকঘর প্রযোজনা করেছেন। ইন্দোরেতর বিভিন্ন মঞ্চে তখন বার পাঁচেক অভিনয় হয়ে গেছিল জিল পরিচালিত ডাকঘরের। উইলিয়ম রাদিচে কলকাতার আনন্দের 'ডাকঘর' প্রযোজনা দেখে সংবর্তকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছিলেন। মঞ্চস্থরে অসেছিলেন, 'মার্টিন কেম্পসেন (ডাকঘর-এর শ্রেষ্ঠতম জার্মান অনুবাদক) আপনাদের প্রযোজনার কথা যেন বারবার আমাকে বলেছেন আজ নিজে চোখে তা দেখলাম। আমি একান্ত অভিভূত।

লণ্ডনে ভারতীয় বিদ্যাভবনে 'ডাকঘর' অভিনয় শেষ হওয়ার মুহূর্তে আবেগাপ্লুত জিল পারকিন ছুটে এসেছিলেন মঞ্চে। দীর্ঘদিন মঞ্চব্যবসী এই পরিচালিকা দেবকন্যাকে (অমল) ছুঁতে উঠিয়ে ধরেছিলেন। শ্রীমতী আচার্যের নাটক দেখার আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, 'আজকের সন্ধ্যাটির জন্যে আমি সংবর্তের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম। এই মুহূর্তে বলে বোঝাতে পারবো না, কেন অমূল্য ঐশ্বর্যে ভরে গেল বুকের ভেতরটা'।

সেদিন 'ডাকঘর' অভিনয় শুরু হওয়ার আগে মঞ্চের ওপর কিছুসময় আমি 'ডাকঘর' এর অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে 'ওয়ার্কশপ' করিয়েছিলাম। দর্শকদের বলেছিলাম, থিয়েটারে অভিনয় দেখার পর — সেই অভিনয়ের সমস্ত চালাকেরা ভাবভঙ্গিতে নাচের ঘরন দেখে রবীন্দ্রনাথ তার ভেতরের আশ্চর্য শক্তিকে কেমন উপলব্ধি করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'কোনো একটা অসাধারণ ঘটনাকে পরিস্ফুটমান করতে চাইলে তার চালাকেরা হাবের সূচনা থেকে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত। অভিনয় শেষে সেদিন অনেক দর্শকের অনেক প্রশ্ন ছিল 'ডাকঘর' এর নতুন করে বিভিন্ন অভিনয় সূত্রে আজকের যুরোপে রবীন্দ্রনাথ কোনরকম অভিঘাত আনতে পারছেন কিনা — এই অন্বেষণে। আমি তাঁদের প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে অমলের ভূমিকায় দেবকন্যার নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরের সময় জিল পারকিন এবং নন্দিতা আচার্যকে, কলকাতার হলেও একটি তথ্য দিয়েছিলাম। তথ্যটি হ'ল, আশিবছর আগে যুরোপে ডাকঘরের প্রথম অমল লিলিয়ান ইয়াংগো যেমন অমলের ভূমিকায় অভিনয় করার আগে হাউপ্টমানের 'হ্যানেলে' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, ঠিক তেমনি লণ্ডনে ডাকঘর অভিনয়ের আশি বছর পূর্তি 'স্মারক অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত দল সংবর্তের 'পাহাড়ীয়ার জন্মনিলে পথিক' নাট্য কোলাজে (হাউপ্টমানের জীবন ও শিল্প নিয়ে নাট্যকোলাজ) হ্যানেলে নাট্যাংশে হ্যানেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছে দেবকন্যা।

এই সূত্রটি ধরেই আরো প্রশ্ন এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের সমকালের নাট্যকার গেরার্ড হাউপ্টমান সমেত ইবসেন, স্ট্রিনবার্গ, এমনকি মেটারলিঙ্কের কথা মনে রেখেও বলা যায় আন্তর্জাতিক নাট্যসাহিত্যে অন্যদের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলো যেমন আর সাড়া জাগাতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বদেশে তাঁর নাটক, বিশেষ করে, 'ডাকঘর' রচনা করছে নতুন নতুন অভিঘাত। পতিতাভূমি, যন্ত্রবিদ্ধ পশ্চিমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কবিতা যখন সরে গেছে, তারা তাদের নিজের ভাষা ও নিজের কালের কবিদের লেখাই সেখানে পড়ে না — সেখানে নতুন অনুবাদে আকুল আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করবে — এতোটা না ভাবাই ভালো। কিন্তু বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রভাবনা যে আবার যুরোপে অন্য একটা মাত্রা রচনা করতে শুরু করেছে — তার গুরুত্ব কম নয়।

ভোলকরাম বেরিং এর সঙ্গে ডাকঘর পরিচালনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা 'স্বাভাবিকতার পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার জন্য অভিনয়ের চারিদিক থেকে বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো কাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহার মূর্তিমান ও গৌরবময়' এর চেষ্টা করেছি। আমাদের সৌভাগ্য এই যে

ফেরিং অরিজিনালিটি, লোকশিল্পীদের কিংবা রূপকথার কবীন্দ্র নাটকের মূলভাব [illegible] করে তাকে উপলব্ধি করার জন্যে আলাদা একজনের কথা ভেবেছেন। তাই আমাদের বিন্যাসে তাকঘরে নাচঘরে লেজনকে সরিয়েও গভীরে রিঘোলিজনকে [illegible] করা হয়েছে। এখনে মূলভাবার এই তাকঘর অভিনয়ের একাধিক ভিডিও চিত্রগ্রহণ নতুন আঙ্গিকের এই প্রযোজনা সম্পর্কে নতুনের দর্শকদের [illegible] একটি অভিজ্ঞান।

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকথা

লিলি ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল কাব্যের জগতে নানান ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। [illegible] এখানে যে কবিতা নিয়ে আলোচনা করব তা হ'ল রূপকথার আঙ্গিকে রচিত কবিতা। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোককথা ও রূপকথার কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এমনকি এই কাহিনী ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রচলিত দেখা যায়। এই রূপকথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "এক যে ছিল রাজা' তখন যদি এর থেকে বেশি কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল না — কেন্ দেশের রাজা, কেমন রাজা এ সবই তুচ্ছ ছিল। আসল যে কথাটি শুনে সমস্ত অন্তর পুলকিত হ'য়ে উঠত সেটি হল — 'এক যে ছিল রাজা" — রূপকথার এই রসব্যঞ্জনা অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের এই রূপকথার রাজ্যে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায় তাঁর ছিন্নপত্রাবলীর পত্র থেকে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো রূপকথা জানতুম এবং সহজ ভাবে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরল ক'রে লিখতে পারতুম, তাহ'লে ঠিক একজনের উপযুক্ত হ'ত।"

এই প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"সোনার তরী" কাব্যের কোন কোন কবিতায় রূপকথার ছোঁওয়া লেগেছে। এই কাব্যের "রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ের" কথা ধরা যাক্ — কবি বলছেন—

"রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,/রাজার মেয়ে কেত তথা।/দুজনে দেখা হোত পথের মাঝে,/কে জানে কবেকার কথা।"

কবির এই রাজার ছেলে ও মেয়ের নীরব ভালবাসার কথা আমাদের মনকেও কবির সঙ্গে ভাবায় "কে জানে কবেকার কথা।"

রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক সাহিত্যে আধুনিক রোমান্টিক চেতনার রস মিশ্রিত করে যা সৃষ্টি করেছেন তার পরিণাম স্বরূপ পেয়েছি 'বিস্মরতী' কবিতা —

"সযত্নে সঞ্চিল রাশী বাঁধিল কবরী/নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ নব নীলাম্বরী/পরিল অনেক সাধে। তারপর ধীরে ধীরে
তপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে/দ্বারামাঝে কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
ওধাইল তারে — 'কহ মেয়ে সত্য করি/সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ওরায় বিরাজে।"

এই কাহিনীর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের 'স্নো হোয়াইট' কাহিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

"নৌকা যাত্রা"-র শিশুর মনের সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাবার ইচ্ছাকেও কবি রূপকথার রঙে রঙীন করে প্রকাশ করেছেন —

"ভোরের বেলা যেব নৌকা ছেড়ে/দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে
দুপর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে/আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।"

"দুটির দিনে" —: সুদীর্ঘ অবসরে শিশু হয়ে ওঠে রাজপুত্তুর। রূপকথাকে অবলম্বন করে তাই কবিকে লিখতে হয় —

"এমনি তরো মেঘ করেছে/সারা আকাশ বেপে/রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে/একলা ঘোড়ায় চেপে।"

রূপকথার সোনার কাঠির পরশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে জাগিয়ে তুলেছেন আমাদের কাছে, তার পরিচয় আমরা এইসব উদ্ধৃতি থেকে পেলেও, রূপকথার আসল পরিচয় আছে 'সানাই'-এর অন্তর্গত "রূপকথার" কবিতায় —

"কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা/মনে মনে।/মেলে নিলেম গানের সুরের এই ডানা/মনে মনে।
তেপান্তরের পারের পেরেই রূপকথার/পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ কথার—/পক্ষীরাজের বন্ধ দুয়ার দিই হানা/মনে মনে।।"

আসলে মনের পক্ষীরাজ ঘোড়াটির পিঠে চড়ে অজানা দেশের রাজপুরীতে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আছে রূপকথার চিরন্তন সত্য ও রসকে আস্বাদন করবার চাবিকাঠি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের সেই বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিয়েছেন তাঁর রূপকথার চাবিকাঠি দিয়ে। রূপকথার রাজ্যে পাড়ি দিতে আমাদের কোন বাধা নেই, নেই কোন বাধা।

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' — কয়েকটি কথা

সুচিত্রা সেন

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আগে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'করুণা', 'বউঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' 'গোরা' — উপন্যাস। সেদিক থেকে 'চতুরঙ্গ' তাঁর সপ্তম উপন্যাস, 'চতুরঙ্গ' চার গল্পের আকারে ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ — ফাল্গুন সংখ্যার 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যথাক্রমে 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ' 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস' নামে।

মানবজীবনজীবনের একটা নবতর ভঙ্গি আমরা 'চতুরঙ্গে' পেলাম। উপন্যাস সম্পর্কে এতকাল প্রচলিত প্রথাগত ও চলিত ধারণাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করে গেলেন এই উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব উপন্যাস।

শচীন, দামিনী, শ্রীবিলাস এই তিনটি চরিত্রের অন্তর্জীবনই এই উপন্যাসে মুখ্য। চারটি সুনির্দিষ্ট অথচ একান্তভাবে ঘনিষ্ঠতাবী অধ্যায়ে বিভাগ জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস। কথক শ্রীবিলাস একই। একজন কথক দ্বারা গল্প বর্ণিত হওয়ার রীতিটি আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। সেই পুরনো রীতিই এই উপন্যাসে নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। এখানে শ্রীবিলাসের ভূমিকা কথকের মাত্র নয়। সে জ্যাঠামশাই, শচীন, দামিনীর সঙ্গে নিজের জীবন ও অন্তর্জীবনকে বিবৃত করে গেছে।

এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে। রবীন্দ্রনাথ এখানে এইরকম অভিনব শিল্পরীতি গ্রহণ করলেন কেন?

চরিত্রগুলির আন্তরসত্তার উন্মোচন ও মনোগহনের বিশ্লেষণই এই উপন্যাসে প্রধান। ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তৃত বিন্যাস, নিটোল গল্পের বিবরণাত্মক ভঙ্গি 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে প্রয়োজনীয় ছিল না। মানুষের মনের নিগূঢ়তম সত্তার উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে অতিবিস্তার শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কখনোই অভিপ্রেত ছিল না। নিপুণ হাতে ছবি আঁকেন যে শিল্পী তিনি যেমন কয়েকটি আঁচড় রেখার টানে সুচিহ্নিত বর্ণের প্রলেপে অভিপ্রেতকে ফুটিয়ে তোলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি এই উপন্যাসে বর্ণনার অতিবিস্তারকে পরিহার করলেন। হেঁয়ালি অপরিহার্য তাই পাঠকের কাছে পৌঁছনো হল। উপন্যাসের আয়তন হল পরিমিত। জোর পড়ল ভাষার ওপরে। ভাষাকে হতে হল ভাবগর্ভ, প্রতীকে, ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

আগেই বলেছি শ্রীবিলাসের ভূমিকা এই উপন্যাসে তথ্যদাতা কথকের নয়। তান্ত্রিক শচীশের তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে নিজেকে খুঁজে ফেরা, দামিনীর প্রবল জীবনার্তি, শচীশের প্রতি তার তীব্র প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের মৃত্যুর যন্ত্রণার কঠিন পীড়ন যার অনুভবের ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছে, সে শ্রীবিলাস। জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনীর জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছে সে এবং এই পর্যবেক্ষণে তার নিজের জীবনও বিশ্লেষিত ও আস্বাদিত হয়েছে — যার পূর্ণ পরিণতি শ্রীবিলাস অধ্যায়ে। উপন্যাসে একজন নায়ক থাকে। সেদিক থেকে এই উপন্যাসের নায়ক কে। শচীশ না শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাস ক্রমশঃ এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিভাবে? সেটি ব্যাখ্যা করা যাক।

পাড়াগাঁ থেকে আসা ঈশ্বরবিশ্বাসী, সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রীবিলাস শচীশের সংস্পর্শে এসে পশ্চিমিটিসিস্ট জগমোহনের শিষ্য হয়েছে। শচীশের প্রতি তার ভক্তি ও ভালবাসা দুই-ই ছিল। কিন্তু সে ক্রমে শচীশের ছায়া থেকে সরে এসে নিজের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করেছে। শচীশকে নিয়ে যেসব ছাত্রদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, শচীশকে ভালবেসেই শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গ করেছে। কিন্তু দামিনীর অবিভাবে শ্রীবিলাসের রূপান্তর পাঠকের অগোচর থাকে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শ্রীবিলাস অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ — "সত্য কথা বলিব। দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে কেন একটা রসের ভিয়ানটা হল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল. জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু'বছর একলা বিরিঞ্চিবাবা, যারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।" শ্রীবিলাসের শচীশ সম্পর্কে এই ঈর্ষা ও জ্বালা আগে ছিল না।

শ্রীবিলাস জীবনবিমুখ তান্ত্রিক নয়, জীবনরসিক। দামিনীকে সে প্রকৃতির চর ভেবে উপেক্ষা করেনি, দূরে সরিয়ে দেয়নি। বরং দামিনীর সঙ্গে সহজ হৃদয়ের সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে। প্রকৃতিকে নিয়েই যে জীবন তাই তার কাম্যিত। শ্রীবিলাস দামিনীর শুষ্ক স্বস্তিত জীবনকে মাধুর্য দান করেছে তার গভীর প্রেমের মহিমা দিয়ে। দামিনীও অমূর্ত ভালবাসার মাধুর্যে শ্রীবিলাসের জীবনকে পূর্ণ করেছে। আর মৃত্যুর পারে দাঁড়িয়ে দামিনীর বাসনাময় একান্ত ভালবাসার ঐকান্তিক আর্তি শ্রীবিলাসকে ঘিরেই; তার প্রার্থনা "সব বিচ্ছিন্ন না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" তাই জীবনবিমুখ শচীশ নয় জীবনপ্রেমিক শ্রীবিলাসই এই উপন্যাসের নায়ক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করছি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে প্রায়ই একটি অভিযোগ শোনা যায় যে সেখানে তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তান্ত্রিকতার নিষ্ফলতাকে দেখিয়েছেন — জগমোহন ও শচীশের মন্ত্র দিয়ে। জগমোহনের পশ্চিমিটিভিজম্ ব্যর্থ হয়েছে নবীবালার মৃত্যুতে আর শচীশের রসসাধনার ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে দামিনীর মৃত্যুতে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখানো হল জীবন কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা বদ্ধ নয়। সে চলে তার নিজস্ব আবেগে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখালেন তত্ত্ব দিয়ে জীবনকে বোঝা নয়, জীবনকে বুঝতে হবে জীবনের মধ্যেই — শ্রীবিলাসে যার সার্থকতা।

আমার ভালোবাসার গান

কবিতা চন্দ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বসন্তের এক গুচ্ছ গানের মধ্যে লিখলেন 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে'। সময় উনিশশ' উনচল্লিশের ফাল্গুন। কবির গানের বাণী আর সুরের মিলনে যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির সৃষ্টি হয় এ তত্ত্ব আমাদের বহুজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর শেষ পর্বের গানগুলিতে এর অতিরিক্ত আরো কিছু আমরা পাই। সেই নিয়েই আজ আমাদের এই আলোচনা।

বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি প্রয়োগ বর্জন সম্পর্কে কিছু মত জানবার আগ্রহে বৃজেন্দ্রপ্রসাদ একসময় রবীন্দ্রনাথকে 'চিঠিতে' তুলেছিলেন। সেইসব চিঠিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে কবি কলহেন তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত ভুলতে ভুলতে তাঁর গান রচনা করেছেন। 'এই উদাসী হাওয়া' গানটিতে কবির সেই সচেতন ভোলা গানটির বাণীকে ভিন্নতর এক মাত্রা দিয়েছে। গানটির স্থায়ী অংশে বাঁধা হয়েছে বেহাগে। এই রাগে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রূপ অনুযায়ী দুটি মধ্যম-ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাগ প্রকাশে প্রাধান্য দিতে হয় শুদ্ধ মধ্যমকেই। কবি আমাদের আলোচ্য গানের বেহাগ অংশে প্রাধান্য দিলেন কড়ি মধ্যমকে।

কবির গানের সুর বাণীর ব্যঞ্জনাবহ। 'এই উদাসী হাওয়া'-ও ব্যতিক্রমী নয়। গানটির আরম্ভের 'এই' অংশটি অর্থাৎ স্থায়ীর মুখের অংশটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সুর থেকে ধরা হয়নি। একবার ধরা হচ্ছে উদারার ঋষভ ও নিষাদ থেকে, অন্যবার মুদারার গান্ধার ও কড়ি মধ্যম থেকে, এই ভিন্ন ভিন্ন সুর থেকে উদাসী হাওয়ার পটভূমি চিহ্নিত করে নিয়ে কবি হাওয়ার চঞ্চলতাকে স্পর্শ করলেন। লক্ষ করুন 'মুকুল গুলি ঝরের' স্বরবিন্যাস পদ্ধতি। এখানে কড়ি মধ্যম ও গান্ধার কে স্পর্শ করে ক্রমাগত দুটি ঘোঁচ সৃষ্টি করলেন কবি। এই প্রয়োগ কৌশলে ধরা পড়ল মুকুল ঝরার অজস্র ধ্বনি আমাদের শ্রুতির কাছে, দৃষ্টির কাছে। এরই পর 'আমি কুড়িয়ে নিয়েছি' এবং 'তোমার চরণে দিয়েছি' এই দুটি বাণীবন্ধের সুরবিন্যাসে কবি শ্রোতার মনে একটা পরাজয় ফুটিয়ে তুললেন। গানটিতে পুরুষ প্রণয় নিবেদক, আর উদ্দিষ্ট নারীটি নির্বাক, প্রতিক্রিয়াহীন ও স্থির প্রতিমার মত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই গানটির সঙ্গে রচিত অন্য দুটি বসন্তের গান। প্রথম গানটি আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, আর দ্বিতীয়টি বসন্ত সে যায় তো হেসে যাবার কালে। প্রথমটিতে বলছেন 'তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি — অজানা সাধনে' ও 'তুমি জান না, চেয়ে রয়েছি তোমার নাম।' দ্বিতীয়টিতে এল কবির শেষপর্বের আঁকা ছবির মত একটি বেদনাহীন মুখের ছবি। জানালেন—

রইব একা ভাসান খেলার নদীর তটে
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে
অবসানের অন্ত আলো তোমার সাথী সেই তো ভাল
যায় সে থাক মিলন শেষের অন্তরালে,

'এই উদাসী হাওয়া' — গানের সুরব্যঞ্জনায় পুরুষের এই অপ্রাপ্তি ফুটে ওঠে। কিন্তু শুধুই কি একক নিবেদন। ফিরে কি কিছুই প্রণয়ী চান না। আমাদের আলোচ্য গানের সঞ্চারী অংশে পুরুষের সেই 'ফিরে' চাওয়ার প্রকাশ পেল 'যেন' শব্দ প্রয়োগে। বললেন যখন যাব চলে, তখন তোমার অনুকূলগুলি আমার রেখে যাওয়া প্রেমমুকুলকে স্মৃতির মালায় গেঁথে প্রস্ফুটিত ফুলের মর্যাদা দেবে। এই 'যখন' থেকে তিনটি পঙ্‌ক্তি অর্থাৎ 'স্মরণ' করে পর্যন্ত সুরটির আরম্ভ ও শেষ অংশটি এল মালার আকারে।

বেহাগ রাগের সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর। উদাসী হাওয়াও বসন্তের পূর্ণিমা রাত্রির গান। একটু অধিক রাত্রেই গেয়। কবি গানের সঞ্চারী অংশে রচনা করলেন পূরবীতে। প্রথমটি শান্ত, গম্ভীর রাগ। দ্বিতীয়টি করুণ। অথচ পূরবী তো দিনরাত্রির মিলনক্ষণের রাগ। তাহলে মিলতে চাওয়ার রাগ নিয়ে কবি বাঁধলেন না মিলতে পারার বেদনাকে। পূরবীতে কড়ি মধ্যম ব্যবহার অনিবার্য। কিন্তু কবি এখানেও বেহাগের মত মধ্যমকেই পরীক্ষার বিষয় করে মধ্যমটির প্রয়োগ পাল্টে দিলেন। অর্থাৎ এই অংশে কড়ি মধ্যম এলই না। তাই 'বিকল ব্যথা'র সুর বিন্যাস হয়ে ওঠে অসাধারণ। পুনরায় আভোগ অংশে আবার ফিরে এল কড়ি মধ্যম প্রয়োগসমেত বেহাগ। বিষাদ করুণ ছড়িয়ে পড়ল গানের শেষ অংশ পর্যন্ত। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা বেহাগকে কি আমরা সেই অর্থে করুণ রাগ বলতে পারি? হিন্দুস্থানী সংগীতের অন্তর ঐশ্বর্যের এই রূপান্তর কি আমাদের চমৎকৃত করে না?

কবি এই গান রচনার কিছু সময় পরে সানাই কাব্যগ্রন্থে 'যাবার আগে' কবিতাটিতে এই কথাগুলিই সাজিয়ে নিলেন একটু অদল বদল করে। এটি কবির ভালোবাসার গান গুলির মধ্যে অন্যতম প্রিয় গান। এই ধরণের গান সম্পর্কে কবির অনুভব যে তিনি তাঁর ভালোবাসার গানগুলি যখন গান তখন তাঁর জীবনের অধরাকেই তিনি পান। পাই না কি আমরাও? কবির শেষ পর্বের এই ধরণের গান যখন বাণী ও সুরের মিলনে একটি চরিত্রের আত্মকথা হয়ে ওঠে, তখন কবির গান কেবল কবির থাকে না, আমাদের প্রতিটি বিচ্ছিন্ন মানুষের একক অনুভবের ক্ষেত্রে গিয়ে নাড়া দেয়। আর তখন এই গান হয়ে ওঠে একলা আমারো ভালোবাসার গান।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে লোককাহিনী ও রূপকথার প্রভাব

বাঁশরি মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় লোকসংস্কৃতিকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া এবং একে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার চেষ্টায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। আমাদের সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটির গুরুত্ব বাইরের রূপটিই তাঁর কাছে আকর্ষক ছিল না। দেশের প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্য লোকসংস্কৃতির চর্চা যে কত প্রয়োজনীয় সে কথা বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ১৩১২ সালে হাজরের প্রতি এক ভাষণে তিনি দেশের কথা, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, ব্রত পার্বণে, রূপকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে স্বদেশের যে পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক দেশে জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎস হল লোকসংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন ধারা। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য, পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, জাতক, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির উদ্ভব এভাবেই হয়েছে।

বিশ্লেষকের বিচারে ছোটগল্পকে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। সেই সময় একজন শক্তিমান লেখকের দেখা পাই আমরা, যাঁর কলমে লোককথা বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক খুলে দিল, তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর লেখা 'শঙ্খমালার' মধ্যে মঙ্গলকাব্য থেকে উঠে আসা চরিত্র ও ঘটনাবলী দেখতে পাই। একটু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা গেলনা। 'শঙ্খমালার' স্বামী সদাগর বাণিজ্যে গেলেন স্ত্রী শঙ্খিকে দুর্গার শাঁখারী ননদের জিম্মায় রেখে। মানিক হরের সহযাত্রীর কথা থেকে উদ্ধার এসে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গেলেন একরাত্রে। শাঁখারী বা কুঁজী ননদ কিছু জানতে পারলো না। ভোরে উঠে ননদ অবাক — 'আঙিনার ছড়া দেয় না বউ? কুঁজী আছে তোদে গা। অতঃপর অন্ত সন্ত্রস্ত ভ্রাতৃবধূকে অসতী আখ্যা দিয়ে বিতাড়ন। সমাজের এই রূঢ় বাস্তব নিকটি রূপকথার মোড়কে মেলিয়ে নিলেন লেখক।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় এই রূপকথার স্পর্শ লক্ষ্য করি। স্বপ্নে বাস্তবে মেশামিশি এক জগৎ। স্বপ্ন মানুষের জাগ্রত অবস্থার চিন্তারই প্রতিফলন মাত্র — মনস্তত্ত্ববিদরা একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Jean Paul Sartre রুমানিয়ান নাট্যকার Eugene Ionesco-র নাটক সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁর রচনা বাস্তবের মাটিতে শিকড় নামিয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবের শক্ত ভিতের উপরেই কল্পনার জগত। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ভাবেই দেখি আমরা স্বপ্নে বাস্তবে কল্পনার মেশামিশি, যা আমরা দেখেছি আমাদের লোক কাহিনী, রূপকথার মধ্যে। লিপিকা'র গল্পগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

রাজপুত্তুর, 'চন্দনী', 'পল্লীর পরিচয়' 'রাজারানী' — এই গল্পগুলির মধ্যে আমরা দেখি বাস্তবকে রূপকথার মোড়কে সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ পেশ করেছেন। 'রাজপুত্তুর' গল্পে একেবারে আধুনিক কালের ঘটনা দেখি। রাজপুত্তুর বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারেনি। তাকে জেল খাটতে হয়েছে। বেরিয়ে আসার পর দীর্ঘ পথ আর শেষ হয়না। তেপান্তরের মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সমীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, 'হুঁড়ি মাউ খড়ি, মনুষের গন্ধ পড়ি'। মানুষকে খাবার জন্য চারিদিকে এত লোভ। দুঃসাহসী রাজপুত্তুরা বারবার পথে বেরোয় এবং বারবার হারিয়ে যায় দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতার মধ্যে। তবু তাদের জন্য অপেক্ষা ফুরোয় না। তাদের কপালে 'অসীম কালের রাজটিকা' _ 'সেই বরযাত্রী মানুষ তেপান্তরের মাঠ দিয়ে কোথায় চলল ... ইতিহাসের মন্তে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ রাজপুত্তুর'। এই অংশে আমরা যেন আর একজন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রকে দেখি। সে 'রক্তকরবী'-র রঞ্জন। নন্দিনীকে কুনো ঘোড়ার পিঠে সে তুলিয়ে নিয়ে যায় কেলার ঘরে। লাখ দেওয়া বন্ধের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে অট্টহাস্য করে। রাজাকে সে আনন্দময় করে তোলে। তার আগমন টের পাওয়া যায় রক্তকরবীর মন্ত্রীর মাধ্যমে। রঞ্জন পরাস্ত হয়। ঈশের মত মৃত্যুবরণ করে। তবু তাদের অভিযান শেষ হয় না। কোনো একদিন 'দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার নিকল সে খুলবে।'

'চন্দনী' গল্পটি ছোট একটি রোমান্স। 'রাজারানী' গল্পেও রূপকথার আভাস। অন্ধ-বয়স বন্দিনের রাজকন্যার দম্ভ, দার্ঢ্য থেকে বিরক্ত রাজা গহন বনে খুঁজে পেলেন সরল নির্ভেজাল বনকন্যাকে, যার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। 'পল্লীর পরিচয়' গল্পে এর উল্টো দিকটি দেখি। কাজরীর কালোরূপ, সারল্য ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধতা রাজপুত্তুরের পছন্দ হল না। রহস্যময়ী হতে পারল না কাজরী। তাই সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সব কটি গল্পই ব্রতকথার ছকে বলা। বয়ান করা ভাষা এর মাধ্যম। বর্ণনার মাধুর্যে রূপকথা যেন ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে।

'গদ্যিকা' রীতির রবীন্দ্রনাথ

দিলীপ কুমার নন্দী

রবীন্দ্র প্রতিভার স্ফুরণ সৃষ্টিশীল রচনাতে শুধু নয়, বিচিত্র ও অভিনব রূপ (form) সৃষ্টিতেও অনন্য। তাঁর জীবনের এক একটি পর্বে কবিতা বলাকা কাঁক বেঁধে এলেও তারা গঠন-শিল্পে একে অন্যের অনুদারী নয়। কবিভাবনা, বিষয় বস্তু, শব্দ বিন্যাস অথবা ছন্দোরীতিতে প্রত্যেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তাঁর কাব্য-ছন্দ সৃষ্টিতেও একটি বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়।

'সন্ধ্যা-সংগীত' কবির কথায় প্রথম স্বকীয়তার পরিচয় নিয়ে এসেছে। এ সময়েই তাঁর কবিতা সুর বা সংগীতকেই মুখ্য আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই সংগীত অর্থের অর্থ — নানাসুরের ঐকতান বা এককেন্দ্রিকতা। তাই ছন্দের দিক থেকেও বিশেষ ভাবমাত্রা ও ভাবোদ্দীপক বিশেষ ধ্বনি পর্বের আবর্তে পাঠকের মনে কবি মনের ভাবটি উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত হয়েছে। বলাকা পর্বে কবির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতায় তিনি যথার্থ "মানুষের কবি হইয়া দেখা দিলেন"। এই মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে কবিভাবনার উপযোগী নূতন ছন্দোরীতির প্রয়োজন ছিল। বলাকার ছন্দে তারই ব্যঞ্জিত অভিব্যক্তি যার পূর্তির ও সার্থকতার প্রকাশ শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থে। কাব্যের এই ছন্দ-রীতি পরিবর্তন ও পরিণতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১) রচনার সময় সন্তরোত্তীর্ণ কবি উপলব্ধি করেছিলেন পৃথিবীর শক্তি ও যৌবন। প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সমতলে ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার আবর্তে যারা বাস করে তাদের অফুরন্ত যৌবন, শক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যেই বিধৃত। গভীরতার এই ঐতিহাসিক বোধ মধুময় ধূলার ধরণীর প্রতি কবিকে আকৃষ্ট করেছে। পৃথিবীর মাটির ডাকে যাত্রার একথা সূচনা। এ পর্বে পরিশেষ (১৯৩১)-এর আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয়মূলক কবিতায় তার প্রকাশ। এই নূতনতর প্রেক্ষিতে নিজেকে প্রস্তুত ও নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছেন, এতদিন যে গান গেয়েছেন তা বৃহত্তর জনসাধারণের কথা নয় এবং যে রীতি ও ভাষায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন তা-ও জনগণের মুখের ভাষণ ও কথার রীতি নয়, অথচ এ কথা তাঁদেরই। সুতরাং তাঁদের বুকের কথা প্রকাশ করতে তাঁদেরই মুখের ভাষা ও রীতি আশ্রয় দরকার। কাজেই কাব্যের অধিকার বাড়াতে রবীন্দ্রনাথকে এ যুগে জীবনধর্মী কবিতাকে আশ্রয় করতে হয়েছে, বর্জন করতে হয়েছে শব্দের অতি মাধুর্য, অতি লালিত্য ও কথা কৌশল। সৃষ্টি হলো "নিরলংকার, বিরল সৌষ্ঠব, অথচ গঠিত, সহজ আভার যুক্ত" পদ্য ছন্দ। পদ্য ছন্দ Prose-Rhythm নয়, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এ হোল 'গদ্যিক' (Prose-verse)। কবি স্বয়ং এর প্রকৃতি নির্দেশ করে বলেছেন — "এ কথা বলা বাহুল্য যে গদ্য কাব্যেও একটা আবাধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তন থেকে কাব্য যেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে। তার ভাগগুলি অসম হয়, কিন্তু সবগুলি জড়িয়ে তার সামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না"। যেহেতু রসবিচারে এ পর্যায়ের রচনাগুলি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ও পরিণত কাব্য — অথচ এর প্রকাশ রীতিটি গদ্যের রীতির মত তাই একে বলা যায় 'ভাবের ছন্দ'।

'গদ্যিক' দীর্ঘ-যতি বিচিত্র চরণে গঠিত, চরণ পর্ববহুল-বর্জিত ও তার দৈর্ঘ অর্থানুযায়ী স্বাধীন, সর্বোপরি সবের বাকও প্রচ্ছন্ন অথচ সরল। যৌগিক শব্দে ভরা। পদ্যে ব্যবহৃত ছন্দোগন্ধী কৃত্রিম শব্দ ও দাদু ক্রিয়াপদ বর্জিত।

রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যিকা' রচনার পেছনে পাশ্চাত্য 'মুক্তক' (vers libre) বা 'গদ্য-কবিতার প্রভাব নেই। যে অন্তরের তাগিদে হুইটম্যান এলিয়ট পদ্য কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন, সেই তাগিদে রবীন্দ্র প্রতিভা ছন্দেরই প্রয়োজনে 'গদ্যিকা' রীতি উদ্ভাবন করে ভালো কাব্য-ছন্দে নূতনত্বের সূচনা করেছেন।

'গদ্যিকার' পূর্বাভাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পুনশ্চর ভূমিকা (১৩৩৯) এবং শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক অভিভাষণে (১৩৩৯) তিনি বলেছেন — গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করবার সময় থেকেই এ ধরনের কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। আরও একটু পেছনে ফিরলে দেখা যাবে 'চিত্রার' প্রেমের অভিষেক' কবিতা থেকেই যেন রবীন্দ্রনাথের মনে গদ্যিক-সত্ত্বার দানা বাঁধছিল। এ কবিতার বর্জিত ও গৃহীত পাঠের তুলনায় আলোচনা করলে এই অনুমানের একটা ভিত্তি পাওয়া যাবে। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার দুটি অংশ — প্রথমাংশটি গদ্যাত্মক। বন্ধু লোকেন পালিতের পরামর্শে তা পরবর্তীকালে বর্জিত হয়। মনে হয়, শেষ পর্বের পুনশ্চ থেকে শ্যামলী পর্বে যে গদ্যিকা রীতি প্রবর্তনা, তা যেন কতকটা দ্বৈধতার অস্পষ্টতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে 'প্রেমের অভিষেক', কবিতার কেয়ারীর জীবন বর্ণনার মধ্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাঁশী কবিতায় কেয়ারীর জীবন চিত্র রচনায়। ছড়িপদর গদ্যাত্মক জীবনের বাস্তবরূপ যেন্তা চিত্রা যুগে সম্ভব হয় নি, নিতান্ত উপযুক্ত শিল্প রীতির অভাবে। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে যেন আকস্মিকভাবে সেই বাহনটির আবিষ্কার করলেন। আর তখন থেকেই কবিমনে যেন এ ধরনের গদ্য ছন্দ রচনার একটি আকাঙ্ক্ষা অন্তরে গোপন করে এসেছেন। পরে লিপিকার (১৯২২) একবার সেসুযোগ এসেছিল, পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় অন্তরের সুত্র পাবেননি, "যোগকরি তাঁরতাই তার কারণ"। লিপিকার দশবছর পর পুনশ্চ (১৯৩২) যে এই রীতির সার্থক ও সুষ্ঠুতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল।

কিন্তু শেষ পর্বের রোগশয্যার আরোগ্য অমনিনে শেষ লেখার কাব্যরীতি, ভাষা, বাগভঙ্গি ও ছন্দোপ্রবাহে এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা গেল। এ পর্বের কবিতার অন্তর মিল বহু ক্ষেত্রে অনুপস্থিত হলেও বৃত্ত প্রবাহের নিয়মিত তাল আবার যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্ভবত কবির সজাগ সচেতন মনে ছন্দ নিয়ে যে অতৃপ্তি বোধ ছিল, তারই পরিণতি। তাই পুনশ্চ পর্বের মনন কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বিশ্বজনের কাব্যভাষা অন্তর্মিল ও বৃত্ত প্রবাহে বৃত্ত প্রবাহমান অসমছন্দে নবরূপে রূপায়িত হল।

রবীন্দ্রনাথ : সুধীন্দ্রনাথ

সংযুক্ত তত্ত্ব

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার পুরনো ধারা আর নতুন ধারার মধ্যে এক নূতনতর সুর সংযোজনের সেতু হিসেবে উল্লেখযোগ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্য 'তন্বী' (১৯৩৩), যার উৎসর্গ পত্রেই ছিল একটি স্বীকারোক্তি বীকৃতি —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে

অর্ঘ্য

কণ শোষের জন্য নয়, কণ বীকরের জন্য।

কাব্য-ভাষা ও কাব্যাদর্শের যে অভেদ্য বন্ধনে কবিতার নির্মাণ আর সৃষ্টি, সেই কাব্যাদর্শের প্রেক্ষিতেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অন্তরে জানে, মনীষায় অন্বেষায়, বিকীরণে অনন্য যে সৌকর্যে গড়ে উঠেছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, সেই কবি তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বীকরণ করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকেই। গ্রহণে বর্জনে রবীন্দ্রোত্তর, রবীন্দ্র-দ্রোহী কবিতার অন্তর্লীন আবেগ মননশীলতায় যে অন্তঃস্পন্দনটি স্তব্ধ হয়েছিল তাই যেন নতুন ভাবে ব্যঞ্জনার রূপে অবয়বে স্পন্দিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্র-মনে সমৃদ্ধ এই কবি তাঁর শক্তির সামর্থে এই গ্রহণের দায়, আনন্দ কোনটাই অবীকার করতে তো চাইলেনই না উপরন্তু পাঠকের হাতে তুলে দিলেন তাঁর সম্পন্ন উপলব্ধির নেপথ্য সূত্র। 'তন্বীর' ভূমিকার বীকরোক্তিটি খুব সহজ—

'পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন — সব সময়ে প্রত্যক্ষরের সম্মতি ক্রমে নয়, কেবল রবীন্দ্রনাথের কণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত।... তবু এই চুরির জন্য আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে. এই অকুণ্ঠ স্বীকারই পাঠককে প্ররোচিত করে সুধীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে। তাঁর অসামান্যতা মুগ্ধ করে ছিল রবীন্দ্রনাথকেও — 'আমার কাছে কণ বীকর করে আজকের দিনে বাংলাদেশে তুমি অসামান্যতা মেলিয়েছ। একেবারেই সাহস করতে না যদি কণটা বাহিরের জিনিষ না হ'ত। কবো তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে। তোমার কবিতা যেখান থেকেই পাওনা নিক না রূপ তো তারই — নিজের তেয়ারা বজায় রেখে সে কিছুই ধার নেয়নি।"

আশ্চর্য এই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা, কাব্য-ভাষা — উপমা, অলঙ্কার ছন্দ উদ্ধৃতি এমনকি পদ তুলে নিয়েই যে কাব্যের কবিতা শরীর নির্মিত সেই গ্রন্থ সর্বত্র সমভাবে বৈশাদৃশ্যেই অভিনব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সূর্যাবর্তে আবর্তিত সুধীন্দ্রনাথকে কেন চেষ্টাকৃত কৌশল গ্রহণ করতে হল না —

আবার, সজনী, শ্রাবণ রজনী/এসেছে ঘুরে,
আবার ঘুরাশা বাসনা ত্রিয়াসা/পঙ্কজে, চমকে দেহের উরে — বাৎসরিক : তন্বী
"তাহারে ছাড় করো হে প্রণাম/আসে জ্যোতির্ময়।" — অনাবৃত : তন্বী
সে যদি আজ বলে মলিন হেসে,/"বলো, পাগল বলো
কোন নিঠুরার স্বর্ণ তাদবেসে/চক্ষু হল জল।
একলা বসে গোপন বিনিময়াতে/গাঁথো যে গীতহার
রচিতে কুসুম ফলয় - শোনিত পাতে/ কণ্ঠে দেবে কার?" — বর্ষারদিনে : তন্বী
মৃত্যুর আড়ালে দেখা করে পড়ে নিভা সুধাধারা/ঘুরাশা সঙ্কিতা,
নীরবে মেরের দেখা হবে না কি পরিচয় সারা/হে অপরিচিতা। — উর্বশী : তন্বী

বা — একলা এক তৃষ্ণা বিধুর বিনিময় রাতে/আলো কালোর মূর্ছনাতে,/দীর্ঘশ্বাসের অবসরে যখন তুমি
বলে ছিলে আমায় চুমি,/"একলা শুধু তোমার সখা বাসি ভালো,/জ্বালো নিরার আগুন জ্বালো

এগুলি কবিতাগুলি রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাবৃত্তে অন্য এক কবিতালোকে পৌঁছে দেয়। এ ছাড়াও রবীন্দ্র কবিতার ভগ্নাংশ, বাক্য শব্দমালা ছড়িয়ে আছে তন্বীর সর্বত্র।

বিস্ময় জাগলো, নানা বিভঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'যাদবী' 'অপরিচিতা', 'চিরন্তনী'ও আস্তে আস্তে পেরে যায় রবীন্দ্রনাথেরই 'লীলাসঙ্গিনী' 'অন্তর্যামী' 'জীবন দেবতার' বিবর্তিত প্রতিমা।

এ ভাবেই রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিভিন্ন প্রান্ত ছুঁয়ে রবীন্দ্র-কণ বীকরে, বীকরণের শক্তিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নিষ্ঠা আমাদের বুঝিয়ে দেয় এই, কণ যতোখানি রবীন্দ্র-উত্তরীয় — তা তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই।

রবীন্দ্র সাহিত্যে কয়েকজন নিঃসঙ্গ রমণী প্রসঙ্গ

ব্রততী ঘোষরায়

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাবক্ষেত্রে নারীর এক সর্বাতিশায়ী বহুৎ ও মাধুর্যের সমন্বিত রসমূর্তি নিয়ত অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে সংখ্যাতীতবার বিচিত্র ও মহত্ত্বযুক্ত রূপ বিশ্লেষণ নয়, এ প্রবন্ধে একটি পৃথক দৃষ্টিপাতে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কয়েকটি নারী হৃদয়ের সান্ত্বনাহীন বেদনা ও শূন্যতার বিকটি নির্দেশ করে তাদের নিঃসঙ্গ মূর্তিটি পরিচিত করানোর চেষ্টা হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পংক্তিতে—"নিঃসঙ্গতা। জেনেছি তোমারি নাম শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বৎসর"। উল্লিখিত নিঃসঙ্গতা আধুনিক মানবসত্তার বিশেষ ভাব লক্ষণ। এই শূন্যতাবোধ রবীন্দ্রসৃজনে ঠিক উপস্থিত না হলেও কখনও কখনও নারীর বাস্তব সমাজগত অবস্থান বা স্বভাব অনুভূতির যথার্থ রূপায়ণের কারণে কয়েকটি রমণী চরিত্রে প্রথিত হয়েছে নির্মম শূন্যতার ছবি। তখন তারা নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর।

আলোচনার ভূমিকায় কবির 'কল্পনা' (১৩০৪-৬) কাব্যের 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতার নায়িকাটির তীব্র বিরহমূর্তির উল্লেখ করা যায় :

"নিশীথা যামিনী একা বসে গান গাহি,
হতাশ পথিক সেবে আমি, সেই আমি।"

— বলা বাহুল্য এই একাকীত্ব আধুনিক নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা প্রকাশক নয়। এটি খাঁটি রোমান্টিক একাকীত্ব। তুলনায় 'মায়ার খেলা' গীতি- নাট্যের (১৮৮৮) প্রমদার প্রেম ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে কঠিন জীবনমুখী এক নিঃসঙ্গতর নারী করে তুলেছে। "চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও। থেকে যেতে কেহ বলিবে না—এটি প্রমদার প্রস্থানপূর্ব হৃদয়কাতরময় ঘোষণা।

আবার, 'খেয়া' (১৩১২-১৩) কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতার নারীটির যক্ষের হৃদয় রাজার দুলালের রথের চাকায় গুঁড়িয়ে গেলেও তার "যক্ষের ধনি ফেলিয়া নিয়া" সে কিভাবে থাকতে পারে, এই অনুভবে মানস-শূন্যতাকে ভরতে পারে। সদৃশতুলনা টানা না গেলেও রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'(১৩২১) উপন্যাসের শ্রাবণ মেঘের অন্তঃশায়ী বিদ্যুতের মত উন্মেষোন্মুখ সেই বিদ্রোহিনী নারী দামিনী'র অর্ধলোকের শূন্যতার পরিমাপ করতে স্থির মেধি, সে শচীশের নিষ্ঠুর পদাঘাত কে মুকে লালন করেছে 'যোগন ঐশ্বর্যের মত, পরশমনির মত"। এই বেদনার যৌতুক নিয়েই যেমন তার শ্রীবিলাসের কাছে আসতে পারা, তেমনই মৃত্যুর মুহূর্তেঅতৃপ্ত জীবন সব ব্যক্ত করে বলা, পরজন্মে যেন শ্রীবিলাসকেই স্বামীরূপে পায়—এই অকপটতার তার হৃদয়ের শূন্যতা পূরণের প্রাণপণ প্রচেষ্টাটি অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে।

সমতুল্যে "স্ত্রীর পত্র' (১৩২১) গল্পের মৃণাল তার চেতনার ব্যাপ্তি নিয়ে বৃহৎ পরিবার পরিজন কিম্বা স্বামীর মানসভূমি থেকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন এক নিঃসঙ্গ সত্তা। কিন্তু যে মুহূর্তে সে সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিকে অতীকার করতে পেরেছে, সেই মুহূর্তে মেঘ যৌ মের জন্ম নিয়েছে স্বতন্ত্র নারী ব্যক্তিত্বের মৃণাল, এবং এই চেতনার জাগরণেই মৃণাল তার মানস আশ্রয় ভূমিটি পেয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ হলেও শূন্যময় যাত্রা তার নয়।

'স্ত্রীর পত্রে'র বহু পূর্বেই 'চোখের বালি' উপন্যাসে (১৩০৮) এক বিদ্রোহিনী ছিল বিনোদিনী। কিন্তু বিনোদিনীর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিভে গেছে, তার মানস শূন্যতা পূরণ হয়ে গেছে বিহারীর প্রেমকে হৃদয়মূলে পেয়ে। অতএব, বিনোদিনীর কাশী গমন নিতান্তই শূন্যহৃদয়ের প্রস্থান পর্ব হয় না। তুলনায়, আশার নিঃসঙ্গতার উপকরণ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, আশার চেতনার বিকাশ সে পথে ঘটান নি। 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) গল্পের 'চারুলতা'র মানস অবস্থান কবি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন নির্মম শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতাবোধের মধ্যে। ভূপতি বা অমল কেউই সে মানস আশ্রয় পায় নি। চারুর অবলম্বনহীন, সান্ত্বনাহীন শূন্যমনে এই রূপায়ণ তাকে একটি নিঃসঙ্গতর পথের অভিচারিণী করেছে।

'যোগাযোগের' (১৩০৪-৩৪) কমু চরিত্রও প্রায় এই রকমই এক নিঃসঙ্গতা বোধের প্রকাশক। স্বামী মধুসূদনের ঘাবতীয় ক্রূরতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ মানসিক প্রতিরোধে সে একটি নিজস্ব মানস-আশ্রয়ভূমি গড়ে তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের সন্তান গর্ভে ধারণ করার নিরুপায়তা তাকে যে কেমন অতল শূন্যতাবোধে ঠেলে দেয় আমরা অনুমান করে শুধু হই, রবীন্দ্রনাথ সেই বিকটির কঠিন ঘবনিকা তোলেন নি।

রবীন্দ্র সাহিত্যের অসামান্য এই রমণীয় সমগোত্রীয়া না হয়ে নিঃসঙ্গতার পথে হেঁটেছে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের অনাথ প্রায় বালিকা রতন। রতন তার পোস্টমাস্টার বাবাবাবুর কাছে জীবনের প্রথম স্নেহ-সহানুভূতি বা সমপ্রাপ্তা লাভ করে এক নিশ্চিত মানস-আশ্রয় গড়ে তুলেছিল। পোস্টমাস্টারের আকস্মিক প্রায় ত্যাগ রতনের সেই মানস আশ্রয়-বায় বুদ্বুদের মত যে মুহূর্তে ফেটে যায়, সেই মুহূর্তে রতনকে প্রায় এক মহাশূন্যতার অনুভূতি গ্রাস করে।

পরতোভাবেই 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা স্বামীর ভালবাসার তপ্তরতা অনুভব করতে পেরে যে বিপুল শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়, সেইটিই তাকে আত্মহননের মূর্খতার ঠেলে দিয়েছে। স্বামীর সন্তাপপ্রাপ্ত চন্দরা বিপুল বিশ্বে এখন একা একাকী। স্বামীর ব্যাকুল প্রার্থনা তীব্র প্রেমে প্রত্যাখ্যান করতে তার কোনো দ্বিধা জাগেনি।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধহীন এক মানস শূন্যতার মধ্যে অবস্থান 'মধ্যবর্তিনী'(গল্পগুচ্ছ) গল্পের হরসুন্দরীর। খুব সাধারণ এই প্রৌঢ়া সন্তানহীনা রমণীটি জনের এক ঔদার্যের আবেগে স্বামীর বংশমর্যাদার তাগিদে স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়েছিল। সপত্নী বালিকা শৈলবালাকে স্বামী সোহাগিনী করার চেষ্টায় সে আন্তরিক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু তার এই ঔদার্য, সস্নেহ অনুভূতি মিথ্যা বোধ হল। যখন সে দেখে গোপনে গোপনে প্রৌঢ় স্বামীটি নববধূর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। এই লুকোচুরি হরসুন্দরীকে বেদনার্ত করে। হরসুন্দরীকে শুধু স্বামীর প্রেম নয়, বালিকা সপত্নীকে বিয়ে দিতে হয় তার শয়ন কক্ষ, সিন্দুকের অলঙ্কার প্রসূন যাবতীয় সুখের উপকরণ। বাস্তিল আদবাবের মত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া হরসুন্দরীকে কিন্তু রুগ্ন সপত্নীর প্রাণপণ সেবাও করতে হয়েছে পরিতোষহীন নির্বিকারত্বে। শৈলবালার মৃত্যুর পরে স্বামীর সঙ্গে একই শয্যাগ্রহণ করতে হয় তাকে। রবীন্দ্রনাথ মৃতা বালিকা শৈলবালার মধ্যবর্তিনী রূপে অনেক অবদান ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু হরসুন্দরীর অবলম্বনহীন ক্রন্দন নিঃসঙ্গতার নিকট যেন নি। পাঠক বুঝে নিতে পারেন সেই শূন্যতার পরিমাপটি।

১৩৪০ সালে, কবির জীবনপ্রান্তের রচনা 'মালঞ্চের নায়িকা নীরজা রোগশয্যায় শুয়ে অনুভব করতে পারে, তার দীর্ঘ দশবছরের বাস্পত্য প্রেম জীবনের ফাঁকি। স্বামী আদিত্য সরলাকে ভালবাসে। কঠিন বেদনায় নীরজাকে একথা বুঝতে হয়েছে। আদিত্য, রমেন কিম্বা সরলার প্রণয়ে তার বেঁচে ওঠার প্রতীক্ষা নেই। রবীন্দ্রনাথ নীরজার প্রাণের আকাশ থেকে কালুনের সব মেঘবিন্দুটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে তাকে বৈরাগ্যের অনন্ত শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছেন। নীরজার সান্ত্বনাহীন চিত্তে তবুও স্বপ্নের ঘর ওঠে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাবতীয় ঔদার্য ভাবনা বিলোপ করে তার চিত্তে জেগে ওঠে নারীর বাস্তব অধিকার বাসনার সত্যতা। শরীর ও মনের সব প্রতিরোধ শক্তি দিয়ে সে সেই অধিকার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। তার পরিণাম অনিবার্যভাবে মৃত্যু। সেই মৃত্যুও তার কাছে সান্ত্বনা নিয়ে আসেনি। এই ভাবনার শূন্যতাবোধে নীরজা গোটা রবীন্দ্র সাহিত্যে এক নিঃসঙ্গতর স্থিরতর পথ পরিক্রমণে চলে যায় না কি।

প্রসঙ্গ : চোখের বালির পরিণতি

বিষ্ণুপদ বেরা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটির স্থান সুউচ্চ হলেও বিতর্কাতীত নয়। এই বিতর্ক দানা বেঁধেছে উপন্যাসের তথা বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতিকে কেন্দ্র করে। একদলের অভিমত "সমাজবুদ্ধির দিক থেকে বিনোদিনীর এই পরিণাম সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ হলেও শিল্পরস এখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।" অপরদলের অভিমত "রবীন্দ্রনাথ সমাজ-শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে বিনোদিনীর এরূপ পরিণাম ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন।"

কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রথমে পরিণতির চিত্রটা উদ্ঘাটন করা উচিত। উপন্যাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, উপন্যাসকাহিনীর অব্যবহিত পরেই আমরা যে বিনোদিনীকে দেখি সে বিধবা, সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। প্রেমবুভুক্ষু বিধবা বিনোদিনী তার অবদমিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য প্রণয়াস্পদকে খুঁজে বেড়িয়েছে। সে ব্যক্তি আর কেউ নয় বিহারী। এরজন্য সে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে মহেন্দ্রকে। এবং অবশেষে যখন বিহারীর কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে তখন বিনোদিনীর উত্তর—"আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না"—আমাদেরকে বিস্মিত করে। কাহিনীর শেষে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার কাশীবাসের সঙ্কল্প গ্রহণই পরিণতি সম্পর্কীয় বিতর্কের কারণ সৃষ্টি করেছে।

কলবাহুল্য বিনোদিনীর এই পরিণতি ক্রমবিবর্তনের ধারানুযায়ী বলে আমাদের মনে হয় না। কেননা যে নারীর মহেন্দ্র ও আশার অবস্থা দেখে "তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল" (১১নং পরিচ্ছেদ); আশা মহেন্দ্রের ঐকান্তিক ভালোবাসার চিত্র দেখে যার মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়—"কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।" এরপর তার সেই সংহার মূর্তি ধারণ এবং ৩৪ নং পরিচ্ছেদে অপমানিতা বিনোদিনী কর্তৃক মহেন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে "যাইব" বলা চারিত্রিক পরিণতির সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ তা ভাববার বিষয়।

আবার ৩৫নং পরিচ্ছেদে বিহারীর প্রতি তার উক্তি "আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল . . . আমার নিজের সুখ দুঃখ কিছুই নাই ?" আসলে বিনোদিনীর মানসিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সুপ্ত কামনা বাসনা বিরাজমান তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই বলতে বাধা নেই যে, যে প্রেমের জন্য সে কাঙাল তাকে লাভ করার মুহূর্তে উচ্চ আদর্শবাদের ঘোষণা বড়ই খাপছাড়া এবং বেসুরো বলে মনে হয়। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উক্ত চরিত্রের বিচার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, "বিনোদিনী চরিত্রে মূল বাস্তবতা ও উচ্চ আদর্শবাদ এই দুইটি বিপরীত ধারার সংযোগ হইয়াছে। অবশ্য এই সংযোগ আর্টের অনুমোদিত সমন্বয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পিশাচী হইতে দেবীতে অতর্কিত পরিবর্তন রোমান্টিক উপন্যাসে অতি সাধারণ ব্যাপার।" এবং "গ্রন্থের শেষ দিক দিয়া বিনোদিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী সে বাস্তব বিশ্লেষণের পরিধি ছাড়াইয়া উধার অসীম ভাবরাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় অবরোহন করিয়াছে। তাহার জীবনের শেষ সঙ্কল্প রোমান্সের রঙীন বাতাসে অঙ্কুরিত হইয়াছে।"

বাস্তবিকই বাস্তবধর্মী উপন্যাসে এই জাতীয় পরিণতি কাম্য বলে মনে হয় না। এ যেন পরিণতির সঙ্গে শরৎ সাহিত্যের পরিণতিকে ফারাক করা যায় না। সুতরাং যে উচ্চ আদর্শবাদের কল্পনার জন্য শরৎচন্দ্রকে অভিযুক্ত করা হয় সেই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের প্রতি নয় কেন ?

স্পর্শা বিবেচিত না হলে বলব, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ কি সামাজিক অকল্যাণকর কাজ ? সমসাময়িক সমাজ মানসিকতার বিচারে এই কাজ কি সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার পথে অনুপযুক্ত ? তা যদি না হয় তাহলে প্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পরিণতি চিত্রণে দেহাতীত প্রেমের সৌন্দর্য দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কেন ?

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অংশের সঙ্গেও এই পরিণতির কারাক বিস্তর। তিনি সেখানে বলেছেন যে "একদিকার ছবি খুব স্পষ্ট, সান্ধ্য-সন্ধ্যার অলক্ষ্যে তাকে আক্রমণ করলে কাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট।"—"চোখের বালিতে" বিনোদিনীর কাশীবাসের পরিকল্পনা কি সান্ধ্যসন্ধ্যার ও অলক্ষ্যের বিভূষিত নয় ? এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পরিণতি চিত্রণে আর একটু সহজ স্বাভাবিক হতে পারলে বাঙালী সমাজ ও পাঠকবৃন্দ উপকৃত হত এবং বিতর্কের অবসান ঘটতো বলে আমাদের বিশ্বাস।